বাংলাদেশে ইসলামের আগমন

এ.কে.এম. নাজির আহমদ

বাংলাদেশে ইসলামের আগমন

এ. কে. এম. নাজির আহমদ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক
এ.কে.এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এন্ড সার্কুলেশান :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com; Email : info@bicdhaka.com

ISBN : 984-842-000-2

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৯৯

তৃতীয় প্রকাশ : রজব ১৪৩৪
জ্যৈষ্ঠ ১৪২০
মে ২০১৩

মুদ্রণে

আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় মূল্য : সত্তর টাকা মাত্র

Bangladeshe Islamer Agomon Written & Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 1st Edition January 1999 3rd Edition May 2013 Price Taka 70.00 only.

‘ইতিহাসে বাংলাদেশ’, ‘বাংলাদেশে ইসলামের আগমন’ ও ‘বাংলাদেশে মুসলিম শাসন’ শীর্ষক তিনটি প্রবন্ধ নিয়ে এই পুস্তিকা। সন্দেহ নেই, প্রতিটি মানুষেরই আপন দেশের ইতিহাস জানা থাকা প্রয়োজন। আবার, এই যুগের মানুষের ব্যস্ততাও অনেক। বিস্তৃত ইতিহাস পড়ার অবসর অনেকেরই নেই। তাই সংক্ষেপে এই দেশের রাজনৈতিক অতীত তুলে ধরার চেষ্টা করেছি সম্মানিত পাঠকদের সুবিধা হবে ভেবে। তাঁদের দু’আ কামনা করে প্রসংগ কথার ইতি টানছি এখানেই।

আল্লাহ্ হাফিয।

এ. কে. এম. নাজির আহমদ

সূচীপত্র

ইতিহাসে বাংলাদেশ

প্রাচীন বাংলাদেশ

বাংলাদেশের পশ্চিম-উত্তরাঞ্চল, পশ্চিম-দক্ষিণাঞ্চল, পূর্বাঞ্চল ও পূর্ব-দক্ষিণাঞ্চল অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। পলিমাটি দ্বারা গঠিত মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চল অপেক্ষাকৃত নতুন।

সর্বপ্রথম কোন সময় বাংলাদেশে মানব বসতি শুরু হয় তা বলা কঠিন। তবে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন অঞ্চলে প্রাচীন মানুষের বসতির নিদর্শন পাওয়া গেছে।

খৃষ্টপূর্ব তিন কি দুই হাজার বছর পূর্বে যখন দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশের পশ্চিম ও মধ্য অঞ্চলে উন্নত জীবন মানের অধিকারী মানব গোষ্ঠীর বসবাস ছিলো তখন বাংলাদেশের পশ্চিম-দক্ষিণাঞ্চলেও সভ্য মানুষের বসবাস ছিলো বলে আভাস পাওয়া গেছে।

উপমহাদেশে আর্যদের আগমন

খৃষ্টপূর্ব ১৭৫০ সনে উরাল পর্বতের দক্ষিণে অবস্থিত কিরঘিজ অঞ্চল থেকে আর্যদের কয়েকটি গোত্র ইরানে প্রবেশ করে। কয়েকটি গোত্র হিন্দুকুশ পর্বত পেরিয়ে এই উপমহাদেশের সিন্ধ ও পাঞ্জাব অঞ্চলে পৌছে। ক্রমাগতভাবে বিভিন্ন গোত্র আসতে থাকে।

আর্যরা ছিলো যাযাবর। তারা ছিলো দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। তারা এই উপমহাদেশের প্রাচীন অধিবাসীদের ওপর চড়াও হয়। তাদের হামলায় ধ্বংস হয়ে যায় হরপ্পা, মোয়েন-জো-দারো, চান-হু-দারো প্রভৃতি সুন্দর শহর। অসংখ্য লোক নিহত হয়। বহু সংখ্যক লোককে বন্দী করে দাসে পরিণত করা হয়।

এইসব হামলা থেকে যারা বেঁচে ছিলো তারা ক্রমশঃ পূর্ব দিকে সরে আসে। আর্যগণও পূর্ব দিকে তাদের অভিযান অব্যাহত রাখে। খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর মধ্যেই আর্যগণ পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে কাশী, কোসল, বিদেহ প্রভৃতি রাষ্ট্রের পত্তন করে। মগধ (দক্ষিণ বিহার) ও মগধের পূর্বে অবস্থিত অংগ রাজ্য তখনো আর্যদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিলো। বংগ ও কামরূপ (আসাম) রাজ্য ছিলো আরো দূরে।

আর্য সমাজ ও ব্রাহ্মণ্যবাদ

আর্যগণ প্রকৃতি ও কল্পিত বহু দেবদেবীর পূজারী ছিলো। তাদের প্রতাপশালী দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র ও বরুনের স্থান ছিলো সর্বোচ্চে।

আর্যদের মাঝে নানা রকম পূজা-পার্বন প্রচলিত ছিলো। তাদের ধর্মের কেন্দ্র ছিলো যজ্ঞ। যজ্ঞের জন্য বড়ো আকারের আগুনের কুণ্ডলী প্রজ্জ্বলিত করা হতো। এতে ক্রমাগত ঘি ও অন্যান্য দ্রব্য নিক্ষেপ করা হতো। একদিকে স্তূপীকৃত হতে থাকতো বলি দেয়া পশুগুলো। বেদিতে বসে ব্রাহ্মণ পাঠ করতে থাকতেন মন্ত্র। এইভাবে সৃষ্টি হতো একটি ভয় ও বিস্ময়ের পরিমণ্ডল। আর্যরা বিশ্বাস করতো যে দেবতারা যজ্ঞস্থলে হাজির হয় ও ভক্তদের সংগে পানাহার করে। আর সন্তান লাভ, ধন-সম্পদ লাভ কিংবা যুদ্ধে বিজয় লাভের আশ্বাস দেয়।

আর্য সমাজে প্রকট জাতিভেদ প্রথা চালু ছিলো। আর্যদের ধর্মীয় গ্রন্থ ঋক-বেদের পুরুষসুক্ত শ্লোকে বলা হয়েছে যে পুরুষের (অর্থাৎ ব্রহ্মার) মুখ থেকে ব্রাহ্মণের, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়ের, উরু থেকে বৈশ্যের ও পা থেকে শূদ্রের জন্ম। তাদের সমাজ ব্যবস্থায় শূদ্রদের জীবনের মূল্য কুকুর-বিড়ালের জীবনের মূল্যের চেয়ে বেশি ছিলো না।

আর্যগণ স্থানীয় যেইসব লোককে পরাজিত করে দাসে পরিণত করে ছিলো, এরা শূদ্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস গ্রন্থে সুনীল চট্টোপাধ্যায় বলেন যে 'চতুর্বর্ণ সমাজে সর্বনিম্ন স্থানে ছিল শূদ্র। উচ্চতর তিন বর্ণের সেবা করাই ছিল তার কাজ। এর মধ্যে ব্রাহ্মণদের সেবা করাই ছিল প্রধান।'

'শূদ্রদের নিচে ছিল অস্পৃশ্যগণ। কখনও তাদের "পঞ্চম জাতি" বলা হত। তারা ছিল আদিবাসি উপজাতি।" চণ্ডালগণ ছিল তাদের মধ্যে প্রধান। মনুতে অনেক সময় চণ্ডালদেরকে কাক ও কুকুরের সঙ্গে একাসনে বসানো হয়েছে। তাদের কোন অধিকার ছিল না। তাদের স্পর্শকেও অপবিত্র মনে করা হত। আর্যদের বাসস্থান, গ্রাম এবং শহরের বাইরে তারা বাস করতো'।

আর্য সমাজে নারীদের কোন মর্যাদা ছিলো না। সম্পত্তির মালিকানায় তাদের অংশ ছিলো না। আর্যগণের ভাষা ছিলো সংস্কৃত। এই ভাষা ছিলো জটিল ও জনগণের জন্য দুর্বোধ্য। আর্যগণ সংস্কৃত ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করতো। অবজ্ঞা করতো অন্যসব ভাষাকে। ঘৃণা করতো সেই সব ভাষায় যারা কথা বলতো তাদেরকে।

আর্যসমাজ ছিলো ব্রাহ্মণ-প্রধান। শুধু ধর্মীয় নয়, আর্যদের সামাজিক জীবনাদর্শও ছিলো ব্রাহ্মণ্যবাদ।

রাঢ়, পুণ্ড্রবর্ধন, বংগ ও সমতট রাজ্য

উল্লেখ্য যে খৃষ্টপূর্ব অষ্টম থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীর কোন এক সময়ে আর্য পণ্ডিতদের দ্বারা ঐতরেয় ব্রাহ্মণ রচিত হয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অনার্য ও দস্যু বলে যেইসব জাতির নাম ঘৃণা ভরে উল্লেখ করা হয়েছে পুণ্ড্র জাতি সেই গুলোর একটি। পুণ্ড্রদের রাজ্যের নাম ছিলো পুণ্ড্রবর্ধন। এর রাজধানী ছিলো পুণ্ড্রনগর। আজকের বগুড়া জিলার মহাস্থান গড়ই সেই কালের পুণ্ড্রনগর। অতীতে পশ্চিম বংগের বীরভূম-বর্ধমান অঞ্চলের নাম ছিলো রাঢ়। বর্তমান বাংলাদেশের উত্তরাংশ ও পশ্চিম বংগের উত্তর-পূর্বাংশ জুড়ে ছিলো পুণ্ড্রবর্ধন। বাংলাদেশের বৃহত্তর ঢাকা, বৃহত্তর ফরিদপুর ও বৃহত্তর যশোর জিলা নিয়ে গঠিত অঞ্চলের নাম ছিলো বংগ। তার দক্ষিণের অঞ্চল পরিচিত ছিলো বঙ্গাল নামে। বৃহত্তর কুমিল্লা ও বৃহত্তর নোয়াখালী অঞ্চলের নাম ছিলো সমতট। আবার, বৃহত্তর সিলেট, বৃহত্তর কুমিল্লা, বৃহত্তর নোয়াখালী ও বৃহত্তর চট্টগ্রামকে একত্রে বলা হতো হরিকেল।

যুগে যুগে এইসব রাজ্যের সীমানার পরিবর্তন ঘটেছে। পরিবর্তন ঘটেছে নামেরও।

মগধ ও অংগ রাজ্যে আর্য প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা

খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মগধ রাজ্য বলতে বুঝাতো পাটনা ও গয়া জিলাকে। এই রাজ্যের রাজধানী ছিলো গয়ার নিকটবর্তী গিরিব্রজ বা রাজগৃহ।

অংগ রাজ্যের অবস্থান ছিলো মগধ রাজ্যের পূর্ব দিকে। মনে হয় প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন রাজ্য ছিলো অংগরাজ্যের মূল ভূ-খণ্ড। চম্পা নদী মগধ রাজ্য ও অংগ রাজ্যের সীমানা রচনা করেছিলো। অংগ-রাজ্যের রাজধানী ছিলো চম্পা নগরী।

খুব সম্ভব খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর শুরুতে বংগ রাজ্য অংগ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। আর স্বাভাবিকভাবেই বংগ রাজ্যেও ব্রাহ্মণ্যবাদের আগমন ঘটে।

মগধ ও অংগ রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা

আর্যদের নিয়ন্ত্রিত রাজ্য হওয়া সত্ত্বেও মগধ রাজ্য ও অংগ রাজ্যের মধ্যে বনিবনা ছিলোনা। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অংগ রাজ্যের রাজা ছিলেন ব্রহ্মদত্ত। সেই সময় মগধ রাজ্যের রাজা ছিলেন, হর্যঙ্ক বংশের ভত্তিয় বা মহাপদ্ম। অংগ রাজ্যের রাজা ব্রহ্মদত্ত মগধ রাজ্য আক্রমণ করেন। যুদ্ধে মগধ রাজ্যের রাজা ভত্তিয় পরাজিত হন। খৃষ্টপূর্ব ৫৪৫ সনে মগধের রাজা হন বিম্বিসার। তিনি তাঁর পিতার পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য অংগ রাজ্য আক্রমণ করেন। যুদ্ধে অংগ রাজ্যের রাজা ব্রহ্মদত্ত পরাজিত হন। অংগ রাজ্য মগধ রাজ্যের অধীনে চলে যায়। উল্লেখ্য

যে বংগ রাজ্য অংগ রাজ্যের সাথে যুক্ত ছিলো বিধায় বংগরাজ্যও মগধ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরোধিতা

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ব্রাহ্মণ্যবাদ আর্য সমাজ নিয়ন্ত্রণ করেছে। চিন্তাশীল মানুষদের একটি অংশ আর্য সমাজে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য, জটিল যাগ-যজ্ঞ ও জাতিভেদ প্রথার অসারতা উপলব্ধি করতো। এই সবের প্রতিবাদ করার সাহস তারা পায়নি।

কিন্তু খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয়াংশে ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী প্রবল আন্দোলন গড়ে ওঠে। এর পেছনে তাওহীদবাদী চিন্তা-চেতনাই ক্রিয়াশীল ছিলো বলে মনে হয়।

বিম্বিসার যখন মগধ সাম্রাজ্যের অধিপতি তখন ইরানের সম্রাট সাইরাস (জুলকারনাইন) হিন্দুকুশ পর্বত পেরিয়ে এসে আর্যদের অন্যতম রাজ্য গান্ধারা জয় করেন। তখন গান্ধারা রাজ্য গঠিত ছিলো পেশাওয়ার, রাওয়ালপিণ্ডি ও কাশ্মীর অঞ্চল নিয়ে। এর রাজধানী ছিলো তক্ষশিলা।

উল্লেখ্য যে সাইরাস (জুলকারনাইন) ছিলেন তাওহীদী জীবন দর্শনে বিশ্বাসী। তাঁর গান্ধারা বিজয়ের পর তাওহীদী জীবন দর্শনের আলোকচ্ছটা এখানে পৌঁছেছিলো নিশ্চয়ই। তখন বিম্বিসার কর্তৃক শাসিত মগধ সাম্রাজ্য থেকে বহু লোক জ্ঞান চর্চার জন্য গান্ধারা যেতো। এদের কেউ কেউ ইরান-সাম্রাজ্যের সহজ সরল উপাসনা পদ্ধতি, সামাজিক সাম্য, নারীর অধিকার ইত্যাদির সাথে পরিচিত হয়ে নতুন ধ্যান ধারণায় উজ্জীবিত হয়ে দেশে ফিরেছে এবং অন্যদের সাথে সেই সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করেছে এমনটি ধারণা করা মোটেই অযৌক্তিক নয়। ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী কোন কোন আন্দোলন সামান্য পরিমাণে ও পরোক্ষভাবে হলেও সাইরাসের গান্ধারা বিজয়ের কাছে ঋণী, এই কথা বোধ হয় জোর দিয়েই বলা চলে।

মগধ সাম্রাজ্যে হর্যঙ্ক বংশের শাসন

আগেই বলেছি বিম্বিসার মগধের রাজা হন খৃষ্টপূর্ব ৫৪৫ সনে। তিনি খৃষ্টপূর্ব ৪৯৩ সন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁর শাসন কালে গৌতম বুদ্ধ ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী বৌদ্ধবাদ প্রচার শুরু করেন। বিম্বিসার ব্রাহ্মণ্যবাদ ত্যাগ করে বৌদ্ধবাদে দীক্ষিত হন।

খৃষ্টপূর্ব ৪৯৩ সন থেকে ৪৬২ সন পর্যন্ত বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু রাজ্য শাসন করেন। খৃষ্টপূর্ব ৪৩০ সন পর্যন্ত মগধ সাম্রাজ্য হর্যঙ্ক বংশের শাসনাধীন ছিলো। উল্লেখ্য যে বিম্বিসার ও অজাতশত্রুর প্রচেষ্টায় মগধ রাজ্য বিশাল মগধ সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। কালক্রমে এই বিশাল সাম্রাজ্যের রাজধানী হয় পাটলীপুত্র।

বলাই বাহুল্য যে হর্যঙ্ক বংশীয় বৌদ্ধ শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধবাদ ব্যাপকভাবে প্রচারিত ও গৃহীত হয়। গৌতম বুদ্ধ প্রাকৃত ভাষায় তাঁর মতাদর্শ প্রচার করেছিলেন। তাই সংস্কৃতের পরিবর্তে প্রাকৃত ভাষা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে।

উল্লেখ্য যে তখন যেহেতু বংগ রাজ্য মগধের হর্যঙ্ক বংশীয় বৌদ্ধ শাসকদের শাসনাধীন ছিলো সেহেতু স্বাভাবিকভাবেই তখন বংগ রাজ্যেও বৌদ্ধবাদের প্রসার ঘটার কথা।

হর্যঙ্ক বংশের শেষ সম্রাট নাগদশক খৃষ্টপূর্ব ৪৩০ সনে তাঁর অন্যতম পারিষদ শিশুনাগের হাতে নিহত হন। শিশুনাগ ও তাঁর পুত্র কালাশোক খৃষ্টপূর্ব ৩৬৪ সন পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

মগধ সাম্রাজ্যে নন্দ বংশের শাসন

খৃষ্টপূর্ব ৩৬৪ সনে মহাপদ্ম নন্দ কালাশোককে হত্যা করে মগধ সাম্রাজ্যের অধিপতি হন। মহাপদ্মনন্দ ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী ছিলেন। সেই জন্য নীচু বংশজাত হওয়া সত্ত্বেও তিনি জনপ্রিয়তা লাভ করেন। নন্দ সম্রাটদের শাসন কালে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতিপত্তি অনেকাংশে হ্রাস পায়। নন্দ বংশীয় নয়জন সম্রাট মগধ সাম্রাজ্য শাসন করেন।

সংগত কারণেই ব্রাহ্মণগণ তাঁদেরকে সুনজরে দেখতেন না। তাঁরা মনে প্রাণে নন্দ সম্রাটদের পতন কামনা করতেন। নন্দ বংশীয় শেষ সম্রাট ধননন্দ ব্যক্তিগত মন্দ আচরণ ও জনগণের ওপর অত্যধিক করারোপ করে জনগণের মনে ক্ষোভ সৃষ্টি করেন। ব্রাহ্মণগণ এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ধননন্দকে উৎখাত করতে সচেষ্ট হন।

মগধ সাম্রাজ্যে মৌর্য বংশের শাসন

খৃষ্টপূর্ব ৩২৪ সনে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য গান্ধারার রাজধানী তক্ষশিলার প্রখ্যাত ব্রাহ্মণ চানক্য বা কৌটিল্যের সহযোগিতায় মগধ সাম্রাজ্যের সম্রাট হন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ব্রাহ্মণ্যবাদের শক্ত পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি মহিলাদের দ্বারা গঠিত দেহরক্ষী বাহিনী পরিবেষ্টিত থেকে প্রাসাদ অভ্যন্তরে আমোদ প্রমোদে মগ্ন থাকতেন। পূজা ও যজ্ঞের জন্য মাঝেমধ্যে বাইরে আসতেন।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসন কালে ব্রাহ্মণগণ আবার প্রতাপশালী হয়ে ওঠেন। সংস্কৃত ভাষা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। বৌদ্ধবাদ ও অন্যান্য মতবাদগুলোর ওপর দুর্দিন নেমে আসে।

খৃষ্টপূর্ব ৩০০ সনে চন্দ্র গুপ্ত মৌর্যের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র বিন্দুসার মগধ সাম্রাজ্যের সম্রাট হন। তাঁর শাসন কালেও ব্রাহ্মণ্যবাদ সরকারী আনুকূল্য পেতে থাকে।

মগধ সাম্রাজ্যে অশোক মৌর্যের শাসন

খৃষ্টপূর্ব ২৭৩ সনে বিন্দুসারের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র অশোক মৌর্য মগধ সাম্রাজ্যের সম্রাট হন। এই সময় কলিঙ্গ রাজ্য ছাড়া উপমহাদেশের প্রায় সকল রাজ্যই মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। সম্রাট হওয়ার পর অশোক মৌর্য কলিঙ্গ রাজ্যের সংগে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। এই যুদ্ধে এক লাখ লোক নিহত ও দেড় লাখ লোক বন্দী হয়। যুদ্ধের ভয়াবহতা অশোক মৌর্যের মনকে দারুণ ভাবে নাড়া দেয়। অচিরেই তিনি ব্রাহ্মণ্যবাদ ত্যাগ করে বৌদ্ধবাদ গ্রহণ করেন। বৌদ্ধবাদের শান্তি ও অহিংসার বাণী তাঁকে আকৃষ্ট করেছিলো। তিনি এই মতবাদ প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর বলিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধবাদ দৃঢ়মূল হয়। প্রাকৃত ভাষা মর্যাদার আসন লাভ করে। খৃষ্টপূর্ব ২৭৩ সন থেকে ২৩২ সন পর্যন্ত অশোক মৌর্য মগধ সাম্রাজ্য শাসন করেন।

চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ দক্ষিণ–পশ্চিম বংগের তাম্রলিপ্তি, কর্ণসুবর্ণ (বর্ধমান বীরভূম মুর্শিদাবাদ), পুণ্ড্রবর্ধন (উত্তর বংগ), বংগ ও সমতট অঞ্চলে স্থাপিত অশোক স্তূপের কথা উল্লেখ করেছেন। এথেকে প্রতীয়মান হয় যে এইসব অঞ্চলে তাঁর শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিলো। এবং সাম্রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলের মতো এই সব অঞ্চলেও বৌদ্ধবাদের প্রসার ঘটেছিলো।

মগধ সাম্রাজ্যে গুপ্ত বংশের শাসন

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত গুপ্ত রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। সম্ভবত গুপ্তদের আদি বাসস্থান ছিলো অযোধ্যা ও বেনারসের মধ্যবর্তী স্থান অন্তর্বেদী।

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত সম্ভবত খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমভাগে রাজ্য শাসন করেন। তাঁর রাজ্য পশ্চিমে প্রয়াগ ও অযোধ্যার দিকে এবং পূর্বে মগধের দিকে কিছু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। তখন লিচ্ছবীগণ পাটলীপুত্র শাসন করতো। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবী বংশে বিবাহ করে পাটলীপুত্রে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পর সম্রাট হন প্রথম সমুদ্রগুপ্ত। আনুমানিক খৃষ্টীয় ৩৫০ সনে তিনি মসনদলাভ করেন। গোটা মগধ, পুণ্ড্রবর্ধন ও বংগ রাজ্য তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। তবে সমতট তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলো না।

সমতট রাজ্য প্রথম সমুদ্রগুপ্তের সময় একটি স্বাধীন করদরাজ্য ছিলো। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শুরুতে সম্রাট বৈন্যগুপ্তের সময় সমতট রাজ্য মগধ সাম্রাজ্যের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে আসে।

খৃষ্টীয় ৫০৭ সনের গুনাইগড় লেখ থেকে জানা যায় যে তখন বৈন্যগুপ্ত এই অঞ্চল শাসন করতেন। তিনি ত্রিপুরা জিলায় (বর্তমান বৃহত্তর কুমিল্লা জিলা) ভূমিদান ও স্বর্ণমুদ্রা জারি করেন।

প্রথম যুগের গুপ্ত বংশীয় সম্রাটগণ গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদী ছিলেন। তাঁদের সময় ব্রাহ্মণগণ রাষ্ট্র পরিচালনায় ও সেনাবাহিনীতে নতুন মর্যাদা লাভ করেন। পরবর্তী যুগের গুপ্ত বংশীয় সম্রাটগণ বৌদ্ধবাদ ও জৈনবাদের প্রতি উদারতা দেখান। ফলে গুপ্ত যুগের প্রথম ভাগে সাম্রাজ্যে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রসার ঘটে এবং পরবর্তী ভাগে বৌদ্ধবাদ অস্তিত্ব প্রকাশ করতে সক্ষম হয় তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের মতো পুণ্ড্রবর্ধন, বংগ ও সমতটেও একই অবস্থা বিরাজ করে।

স্বাধীন বংগ রাজ্য

খৃষ্টীয় ৫০৭ সনের কিছুকাল পর বংগ রাজ্য একটি স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। এই স্বাধীন রাজ্যের স্থপতি ছিলেন রাজা গোপচন্দ্র। পশ্চিম বংগের অংশ বিশেষও তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিলো। রাজা গোপ চন্দ্র আঠার বছর রাজ্য শাসন করেন। তাঁর পর বংগ রাজ্যের রাজা হন ধর্মাদিত্য।

অতপর সমাচার দেব। তিনি চৌদ্দ বছর রাজ্য শাসন করেন। সমাচার দেব স্বর্ণ মুদ্রা জারি করেন।

ঢাকা জিলার সাভার ও ফরিদপুরের কোটালীপাড়ায় অনেকগুলো নিম্নমানের স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে। এথেকে অনুমিত হয় যে এই অঞ্চলে অন্যান্য রাজাও ছিলেন। তাঁদের মধ্যে পৃথ্বীর ও সুধন্যাদিত্য নাম দুইটির পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়েছে। অন্যান্য অঞ্চলেও বিভিন্ন সময় ছোট ছোট রাজাগণ রাজত্ব করতেন তার আভাস পাওয়া যায়।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্তদের শাসিত বিশাল মগধ সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে অনেকগুলো ছোট ছোট রাজ্য গড়ে ওঠে। উত্তর ভারতের মধ্যাঞ্চল–রাজপুতানা-পাঞ্জাবের–একাংশের রাজা হন যশোধর্মন। থানেশ্বর রাজ্যে পুষ্যভূতি বংশের রাজত্ব কায়েম হয়। কনৌজ রাজ্যে মৌখরি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

বিশাল মগধ সাম্রাজ্য কেবল মগধ ও মালবে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। 'পরবর্তী গুপ্ত বংশ' নামে একটি রাজবংশ মগধ-মালব রাজ্য শাসন করতে থাকে।

স্বাধীন গৌড় রাজ্য

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে পুণ্ড্রবর্ধন ও মগধ রাজ্য গৌড় রাজ্য নামে পরিচিতি লাভ করে।

'পরবর্তী গুপ্ত বংশের' শাসনের বিলুপ্তি কালে আনুমানিক খৃষ্টীয় ৬০১ সনে অর্থাৎ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর সূচনাতে গৌড় রাজ্যের রাজা হন শশাঙ্ক। তাঁর রাজধানী ছিলো কর্ণসুবর্ণ (বর্তমান মুর্শিদাবাদের রাংগামাটির নিকট অবস্থিত কানসোনা)।

তিনি রাঢ় অঞ্চলে তাঁর রাজ্য বর্ধিত করেন। উড়িষ্যার চিলকা হ্রদ পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তৃত ছিলো। বংগ রাজ্য ও সমতট রাজ্য তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলো কিনা, বলা যায় না।

মালব রাজ্য তখন মগধ থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়েছিলো।

কনৌজ রাজ্যের মৌখরী বংশীয় রাজাগণ ছিলেন বৌদ্ধ। থানেশ্বর রাজ্যের পুষ্যভূতি রাজাগণও ছিলেন বৌদ্ধ। কনৌজের রাজা গ্রহবর্মন থানেশ্বরের রাজা প্রভাকর বর্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রীকে বিয়ে করেন। ফলে উভয় রাজ্যই শক্তিশালী হয়।

মালব রাজ্যের রাজা দেবগুপ্ত কনৌজের মৌখরী গণকে ভালো চোখে দেখতেন না। গৌড় রাজ্যের গোঁড়া হিন্দু রাজা শশাঙ্কও কনৌজের মৌখরী গণকে শত্রু গণ্য করতেন। ফলে কনৌজ— থানেশ্বর শক্তিকে খর্ব করার জন্য গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক মালবের রাজা দেবগুপ্তের সংগে মৈত্রী গড়ে তোলেন।

থানেশ্বর রাজ প্রভাকর বর্ধনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই মালব রাজ দেবগুপ্ত কনৌজের ওপর আক্রমণ চালিয়ে গ্রহবর্মনকে নিহত ও রানী রাজ্য শ্রীকে বন্দী করেন। কনৌজ পদানত করে তিনি থানেশ্বরের দিকে অগ্রসর হন। থানেশ্বরের নতুন রাজা রাজ্যবর্ধন তাঁর ভাই হর্ষবর্ধনের হাতে শাসনভার অর্পণ করে নিজে সেনাবাহিনী নিয়ে দেব গুপ্তের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। যুদ্ধে দেবগুপ্ত পরাজিত হন। এবার দেবগুপ্তের মিত্র রাজা শশাঙ্ক তাঁর সেনা বাহিনী নিয়ে রাজ্যবর্ধনের সম্মুখীন হন।

এই সময় শশাঙ্ক রাজ্য বর্ধনের নিকট আপন কন্যা বিবাহ দেবেন ও শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করবেন আশ্বাস দিয়ে রাজ্য বর্ধনকে তাঁর শিবিরে আমন্ত্রণ জানান। রাজ্য বর্ধন যখন খাবার খাচ্ছিলেন তখন তাঁর ওপর হামলা চালিয়ে তাঁকে হত্যা করা হয়। রাজ্য বর্ধনের হত্যার পর রাজা শশাঙ্ক অপ্রতিদ্বন্দ্বী শাসক হয়ে ওঠেন। অবশ্য থানেশ্বর রাজ্যের এই দুর্দিনে কামরূপ (আসাম) রাজ ভাস্করবর্মন থানেশ্বরের নতুন রাজা হর্ষ বর্ধনের সাথে মৈত্রী চুক্তি করেন। এতে রাজা শশাঙ্ক দ্রুত কনৌজ ত্যাগ করে গৌড়ে ফিরে আসেন।

রাজা শশাঙ্কের বৌদ্ধ পীড়ন

উত্তর ভারতের বৌদ্ধ রাজাগণ হীনবল হয়ে পড়লে রাজা শশাঙ্ক ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রসার ঘটানোর প্রচেষ্টা চালান। তিনি বৌদ্ধবাদের ওপর অত্যাচার করেন। তিনি বৌদ্ধদেরকে হত্যা করার জন্য সরকারী কর্মচারিদের প্রতি নির্দেশ জারি করেন।

শশাঙ্কের নির্দেশে গয়াতে অবস্থিত বৌদ্ধদের বোধিবৃক্ষ কেটে ফেলা হয়। বহু বৌদ্ধ নিদর্শন ভেংগে ফেলা হয়, নদীতে নিক্ষেপ করা হয় কিংবা পুড়িয়ে ফেলা হয়।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে বংগ দেশ ও কামরূপে ব্রাহ্মণ্যবাদ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলো। সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকেরা এর পৃষ্ঠপোষকতা করতো। তবুও হিউয়েন সাঙের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে তখন বংগ রাজ্যের সর্বত্র বৌদ্ধবাদেরও যথেষ্ট প্রভাব ছিলো।

সম্ভবত খৃষ্টীয় ৬৩৭ সনে শশাঙ্কের মৃত্যু হয়। খৃষ্টীয় ৬৩৮ সনে চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ এই অঞ্চল সফরে আসেন। হিউয়েন সাঙ এই অঞ্চলে তখন নিম্নোক্ত পাঁচটি রাজ্য দেখেনঃ কজঙ্গল (রাজমহল), পুণ্ড্রবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ, সমতট ও তাম্রলিপ্তি।

আনুমানিক খৃষ্টীয় ৬৪১ সনে থানেশ্বর-কনৌজের অধিপতি হর্ষবর্ধন মগধ রাজ্য জয় করেন। খৃষ্টীয় ৬৪২ সনে তিনি কজঙ্গল (রাজমহল) রাজ্যে অবস্থান করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

হর্ষবর্ধনের মিত্র কামরূপ রাজ ভাস্করবর্মন কর্ণসুবর্ণ রাজ্য আপন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

উল্লেখ্য যে শশাঙ্ক যখন গৌড় রাজ্যের ও হর্ষবর্ধন থানেশ্বর-কনৌজের অধিপতি তখন অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৬১০ সনে আরব উপদ্বীপে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) ইসলামী জীবন দর্শন প্রচার শুরু করেন। খৃষ্টীয় ৬২২ সনে তিনি ইয়াসরিবে, যা পরে মদীনা নামে পরিচিত হয়— ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করেন।

বংগ রাজ্যে ভদ্র বংশের শাসন

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধের কোন একসময়ে বংগ রাজ্যে (ঢাকা-ফরিদপুর-যশোর) ভদ্রবংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ভদ্র রাজাগণ ছিলেন ব্রাহ্মণ। ফলে স্বভাবতই বংগ রাজ্যে তখন ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রসার ঘটে।

সমতট রাজ্যে খড়গ বংশের শাসন

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সমতট রাজ্যে খড়গ বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। খড়গ রাজাগণ ভদ্র বংশের উচ্ছেদ সাধন করে ছিলেন। তাই মেনে নিতে হয় যে

বংগ রাজ্যও তাদের দখলে আসে। ঢাকা জিলার আশরাফপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসন ও কুমিল্লা জিলার দেউলবাড়িতে প্রাপ্ত একটি মূর্তি লিপি থেকে খড়গোদ্যম, জাত খড়গ ও দেব খড়গ নামক তিন রাজার কথা জানা গেছে। খড়গ রাজাদের রাজধানী ছিলো কর্মান্ত বাসক। কুমিল্লা জিলার বড়কামতাই সম্ভবত সেই কর্মান্তবাসক। খড়গ রাজাগণ বৌদ্ধ ছিলেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা বৌদ্ধবাদের পৃষ্ঠ পোষকতা করেন।

সমতট রাজ্যে দেব বংশের শাসন

খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের প্রথমভাগে এই অঞ্চলে দেব বংশের রাজত্ব কায়েম হয়। শ্রী শান্তিদেব, শ্রী বীরদেব, শ্রী আনন্দ দেব ও শ্রী ভবদেব এই রাজ্য শাসন করেন। তাঁদের রাজধানী ছিলো দেব পর্বত। সম্ভবত কুমিল্লা জিলার লালমাই পাহাড়ে এটি অবস্থিত ছিলো।

গৌড় রাজ্যে পাল বংশের শাসন

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে পুরাতন গৌড় রাজ্যের ভগ্ন স্তূপের ওপর একটি সুশৃংখল রাজ্য গড়ে তোলার জন্য নেতৃস্থানীয় লোকেরা উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁরা বরেন্দ্র ভূমির (পুণ্ড্রবর্ধন) বপ্যট নামক এক ব্যক্তির সুযোগ্য সন্তান গোপালকে রাজা নির্বাচিত করেন। সম্ভবত খৃষ্টীয় ৭৫০ সনে গোপাল গৌড়ের রাজা হন। খৃষ্টীয় ৭৭৫ সনে ধর্মপাল গৌড়ের রাজা হন। তিনি কনৌজে কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। তাঁর রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দেন গান্ধারা (পশ্চিম পাঞ্জাব), মদ্র (মধ্য পাঞ্জাব), কীর (কাংড়া), কুরু (থানেশ্বর), মৎস্য (জয়পুর), অবন্তি (মালব), যবন (সিন্ধের মুসলিম রাজ্য), যদু (পাঞ্জাবের সিংহপুর) ও ভোজ (বেরার) এর রাজাগণ।

পাল বংশীয় রাজাগণ চারশত বছর রাজ্য শাসন করেন। কালক্রমে তাঁদের প্রতিপত্তি কমে আসে এবং রাজ্য সীমা সংকুচিত হয়। ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রবল চাপে অন্যান্য রাজ্যে বৌদ্ধবাদ কোনঠাসা হয়ে পড়ে। পাল রাজাগণ সকলেই ছিলেন বৌদ্ধ। আর তাঁদের শাসিত রাজ্যই ছিলো বৌদ্ধবাদের শেষ আশ্রয়স্থল।

উল্লেখ্য যে মহাযানপন্থী বৌদ্ধগণ বৌদ্ধবাদকে অনেকাংশে পরিবর্তিত করে ফেলেন। বুদ্ধের মতবাদে কোন দেবতা বা উপদেবতার স্থান ছিলো না। কিন্তু মহাযানপন্থী বৌদ্ধগণ বুদ্ধকেই দেবতা বানিয়ে ফেলেন। ফলে বৌদ্ধবাদেও পূজা অর্চনা স্থান লাভ করে। পাল রাজাদের আমলে পুণ্ড্রবর্ধনে এই পরিবর্তিত বৌদ্ধবাদই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

পাল আমলে বাংলা ভাষার উদ্ভব ঘটে। মাগধী প্রাকৃত ভাষার গৌড়-বংগীয় রূপই এই ভাষার আদিরূপ। বৌদ্ধ প্রচারকগণই প্রথম এই ভাষায় তাঁদের পদ রচনা করেন। কয়েক শতাব্দী ধরে বৌদ্ধ কবিগণ এই সাহিত্য ধারা অনুসরণ করেন। তাঁদের রচিত পদ সংকলন, চর্যাপদ, প্রাচীনতম বাংলা ভাষার নিদর্শন।

সমতট রাজ্যে চন্দ্র বংশের শাসন

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শুরু থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সমতট (দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায়) চন্দ্র বংশীয় রাজাদের রাজত্ব কায়েম ছিলো।

চন্দ্র বংশের প্রথম ভূপতি পূর্ণ চন্দ্র রোহিত গিরির (সম্ভবত কুমিল্লা জিলার লালমাই অঞ্চলের) ভূ-স্বামী ছিলেন। তাঁর পুত্র সুবর্ণ চন্দ্রও তা-ই ছিলেন। তাঁর পুত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্র হরিকেলের রাজার অধীনে একজন সামন্ত রাজা ছিলেন।

ত্রৈলোক্যচন্দ্র প্রথমে চন্দ্রদ্বীপে (বরিশাল ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে) স্বাধীন রাজ্য কায়েম করেন। পরে তিনি সমতট জয় করেন।

ত্রৈলোক্যচন্দ্র আনুমানিক খৃষ্টীয় ৯০০ সন থেকে ৯৩০ সন পর্যন্ত রাজ্য শাসন করেন। তাঁর পর তাঁর পুত্র শ্রী চন্দ্র রাজা হন। খৃষ্টীয় ৯৭৫ সন পর্যন্ত তিনি রাজ্য শাসন করেন। তিনি বিক্রমপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। এখেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে বংগ রাজ্য তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিলো। তিনি সিলেট জয় করেন।

শ্রীচন্দ্র যখন সমতট-বংগের রাজা তখন কাম্বোজদের আক্রমণে গৌড়ের পাল বংশীয় রাজা দ্বিতীয় গোপাল গৌড় থেকে বিতাড়িত হন। শ্রীচন্দ্র তাঁর সাহায্যে এগিয়ে যান। তাঁর সাহায্যে দ্বিতীয় গোপাল গৌড়ে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হন। অতপর কল্যাণ চন্দ্র, লডহ চন্দ্র ও গোবিন্দ চন্দ্র রাজ্য শাসন করেন। গোবিন্দ চন্দ্রই চন্দ্র বংশের শেষ রাজা। ভূ-স্বামী সুবর্ণ চন্দ্র থেকে শুরু করে গোবিন্দ চন্দ্র পর্যন্ত এই বংশের সকল রাজা বৌদ্ধ ছিলেন। গৌড়ের বৌদ্ধ পাল বংশীয় রাজাদের সাথে তাঁদের সু সম্পর্ক ছিলো।

চন্দ্র বংশীয় রাজাদের শাসন কালে সমতট ও বংগ রাজ্যে বৌদ্ধবাদ দৃঢ়মূল হয়।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সম্ভবত বংগরাজ্য ও সমতটে গৌড়ের পাল রাজাদের প্রত্যক্ষ শাসন সম্প্রসারিত হয়।

সমতট রাজ্যে বর্মন বংশের শাসন

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে গৌড় রাজ্যের বরেন্দ্র অঞ্চলে সামন্ত বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই বিশৃংখলার সুযোগে সমতটে ও বংগ রাজ্যে বর্মন বংশের শাসন

প্রতিষ্ঠিত হয়। জাত বর্মন, হরিবর্মন, সামল বর্মন ও ভোজ বর্মন এই রাজ্য শাসন করেন। সামল বর্মন একটি ব্রাহ্মণ পরিবারকে তাঁর রাজ্যে এনে প্রতিষ্ঠিত করেন। ভোজ বর্মনের রাজধানী ছিলো বিক্রমপুর। সামগ্রিকভাবে বর্মন বংশীয় রাজাগণ বৌদ্ধদেরকে ঘৃণার চোখে দেখতেন।

গৌড় রাজ্যে সেন বংশের শাসন

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বরেন্দ্র অঞ্চলে গৌড়ের বৌদ্ধ পাল শাসনের বিরুদ্ধে সামন্ত বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই সময় গৌড়ের রাজা ছিলেন মদন পাল। বিশৃংখল পরিস্থিতির সুযোগে বিজয় সেন নামক একব্যক্তি বরেন্দ্র অঞ্চল থেকে পাল শাসন এবং বংগও সমতট রাজ্য থেকে বর্মন শাসনের অবসান ঘটিয়ে সেন বংশের শাসন কায়েম করেন।

দক্ষিণ ভারতের কর্ণাট ছিলো সেনদের আদি বাসস্থান। এই বংশের পূর্ব পুরুষগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন। পরে তাঁরা ক্ষত্রিয় হন।

সামন্ত সেন কর্ণাট থেকে রাঢ়ে এসে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর পুত্র হেমন্ত সেন রাঢ় অঞ্চলে গৌড়ের পাল রাজাদের সামন্ত ছিলেন। তাঁর পুত্র বিজয় সেন স্বাধীন রাজা হন। তিনি আনুমানিক খৃষ্টীয় ১০৯৮ সন থেকে ১১৬০ সন পর্যন্ত রাঢ়ের রাজা ছিলেন। প্রথমে রাঢ় অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হলেও পরে তিনি উত্তর বংগ জয় করেন। অতপর বংগ-সমতটের বর্মন বংশীয় রাজাকে পরাজিত করে এই অঞ্চল দখল করেন। সেই সময় পাল বংশের শাসন কেবলমাত্র মগধেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

বিজয় সেন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রাহ্মণগণ বিত্তশালী ও প্রতাপশালী হয়ে ওঠেন।

খৃষ্টীয় ১১৬০ সনে তাঁর পুত্র বল্লাল সেন গৌড় রাজ্যের রাজা হন। তিনি কুলীন প্রথা প্রবর্তন করেন। সমাজে কুলীনদের বিশেষ মর্যাদা স্বীকৃত হয়।

খৃষ্টীয় ১১৭৯ সনে তাঁর পুত্র লক্ষণ সেন গৌড় রাজ্যের রাজা হন। তিনি গৌড়েশ্বর উপাধি ধারণ করেন। গৌড় রাজ্য তখন লক্ষণাবতী নামেও পরিচিত হয়।

সেন রাজাদের শাসন কালের বিভিন্ন দিকের ওপর আলোকপাত করেছেন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ সুনীল চট্টোপাধ্যায়। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস নামক গ্রন্থে তিনি লিখেছেন ঃ "সেন রাজাদের সময় বৌদ্ধ ধর্মের অস্তিত্ব ছিলো। লক্ষণ সেনের তর্পণদীঘি লেখ তে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু সেন রাজাদের বিস্তৃত দান তালিকায় বৌদ্ধদের জন্য দানের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। সুতরাং বলা যায় যে

পাল রাজাদের ধর্ম বিষয়ে যে উদারতা ছিলো, সেন রাজাদের তা ছিলো না। তাঁরা পাল যুগের গতি-প্রকৃতি এবং আদর্শকে বর্জন করে বৈদিক, স্মার্ত ও পৌরাণিক যুগের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা বিভিন্ন ধর্ম ও আদর্শের সমন্বয়ের কথা ভাবেন নি, একমাত্র ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সমাজদর্শনকেই মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। এর ফল যা হওয়ার তাই হয়েছিলো। ব্রাহ্মণগণ সমাজের উচ্চ চূড়ায় আরোহন করেছিলেন। কিন্তু সমাজের অন্যান্য স্তর থেকে তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন।" ২/৩১৬

"অধ্যয়ন, অধ্যাপনা এবং ধর্মকর্ম ব্রাহ্মণদের প্রধান বৃত্তি ছিলো। তাঁদের মধ্যে অনেকে রাষ্ট্র ও অভিজাত শ্রেণীর আনুকূল্যে প্রচুর অর্থ ও জমির মালিক হয়েছিলেন। অনেকে প্রত্যক্ষভাবে রাজকার্যে অংশ নিতেন। তাঁরা যুদ্ধে নেতৃত্ব দিতেন এমন প্রমাণও আছে। তাঁদের জন্য কৃষি বৃত্তিও নিষিদ্ধ ছিলো না। অথচ শূদ্রদের অধ্যাপনা, তাঁদের পূজানুষ্ঠানে পৌরহিত্য এবং চিকিৎসা, জ্যোতির্বিদ্যা ও চিত্রশিল্পসহ অন্যান্য শিল্পচর্চা নিষিদ্ধ হয়েছিলো। এ থেকে শূদ্রদের সম্পর্কে এবং তাঁদের নিজস্ব জীবন বোধ সম্পর্কে সংকীর্ণতার পরিচয় পাওয়া যায়।" ২/৩১৬

"সমাজের এক দিকে ছিলেন মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়, অন্য দিকে অন্ত্যজ ম্লেচ্ছ সম্প্রদায়, আর মধ্য স্থলে বৃহৎ শূদ্র সম্প্রদায়। বলা বাহুল্য এই ব্যবস্থা সমাজ স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল ছিলো না।" ২/৩১৭

"এই যুগেই বাঙলায় আধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে ভাগবত ধর্মী ও সহজযানী সাধকদের আবির্ভাব ঘটেছিলো, যাঁরা তুচ্ছ জাত-পাতের উর্ধে উঠে মানুষের অন্তর্নিহিত ঐক্যের কথা বলেছিলেন। কিন্তু তাঁদের চিন্তা ও সাধনা ব্যক্তি জীবনকে প্রভাবিত করলেও, তৎকালীন সমাজ জীবন ও রাজনীতিকে করেনি।" ২/৩১৭

"তখন যাঁরা শহরে বাস করতেন তাঁদের স্বভাবে সংযমের অভাব ছিলো। পবনদূত ও রামচরিত কাব্য দুইটি সভা নন্দিনীদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কেশব সেনের ইদিলপুর লেখ এবং বিশ্বরূপ সেনের সাহিত্য পরিষদ লেখ থেকে জানা যায় যে প্রতি সন্ধ্যায় তাদের নুপুর নিক্কনে সভা ও প্রমোদাগারগুলি মুখরিত হতো। জীমূত বাহনের 'দায়ভাগ' নামক গ্রন্থে আছে যে গ্রাম ও শহরে যাঁরা ধনী তাঁরা দাসী রাখতেন এবং তার উদ্দেশ্য খুব সাধু ছিল না। অস্থাবর সম্পত্তির মতো তাদের কেনা-বেচা হতো। তার ওপর দেব-দাসী প্রথা ছিলো। পাল আমলে এই প্রথা খুব ব্যাপক ছিলো না। কিন্তু সেন আমলে, দক্ষিণা প্রভাবে এই প্রথা ব্যাপক আকার ধারণ করেছিলো।" ২/৩১৯,৩২০

"গরীব মানুষের নিরানন্দ জীবনে ধনীগৃহের ব্রত পার্বন, পূজা উৎসবই ছিলো একমাত্র আনন্দ। দরিদ্রতর শ্রেণীর মানুষ নিজেদের মধ্যে নৃত্য-গীতের মাধ্যমে দুঃখ কষ্ট ভুলতে চাইতো।.... চুরি ডাকাতির ভয় ছিলো। ঘরে তালা দিতে হতো। প্রহরীর প্রয়োজন ছিলো। পূর্বে যেই যৌতুকের কথা বলা হয়েছে, তার লোভে অনেক সময় উচ্চবর্ণের পুরুষ নিম্ন বর্ণের কন্যাকে বিবাহ করতো। অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ গ্রামের বাইরে বাস করতো। উচ্চ বর্ণের মানুষের সঙ্গে তাদের ছোঁয়াছুঁয়ি ছিলোনা।" ২/৩২০

"পাল রাজাদের সময় বৌদ্ধধর্ম বিশেষ প্রাধান্য অর্জন করেছিলো। আবার সেন রাজাদের সময় ব্রাহ্মণ্যধর্ম বড় হয়ে দেখা দিয়েছিলো। পাল রাজাদের সময় বৌদ্ধ ধর্মের পাশাপাশি জৈনধর্ম ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম স্বমহিমায় বিরাজ করতো। কিন্তু সেন আমলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অপ্রতিহত প্রভাবে অন্যান্য ধর্ম ম্রিয়মান হয়ে পড়েছিলো।" ২/৩২৭

"তাঁদের (সেন রাজাদের) সময় বাঙলায় সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি ঘটেছিলো।" ২/৩০৬

"তাঁরা হিন্দু সংস্কৃতিতে নূতন প্রাণের সঞ্চার করেছিলেন।" ২/৩০৬

সেন শাসিত গৌড় রাজ্যের তিনটি রাজধানী ছিলো ঃ নদীয়া (নবদ্বীপ), গৌড় ও বিক্রমপুর। খৃষ্টীয় ১২০৩ সনের তুর্ক মুসলিম ইখতিয়ারউদ্দীন মুহাম্মাদ বাখতিয়ার খালজী একদল অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে নদীয়া এসে পৌছেন। তাঁর আগমন সংবাদ শুনে রাজ প্রাসাদের পেছন দরওয়াজা দিয়ে খালি পায়ে লক্ষণ সেন পালিয়ে যান। তিনি নদীপথে বিক্রমপুর এসে পৌছেন। ইখতিয়ারউদ্দীন মুহাম্মাদ বাখতিয়ার খালজী অতপর গৌড় জয় করেন।

আনুমানিক খৃষ্টীয় ১২০৫ সনে লক্ষণ সেনের মৃত্যু হয়। তাঁর পর বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন বিক্রমপুর কেন্দ্রিক বংগ-সমতট রাজ্য শাসন করেন।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিক্রমপুরে সেন শাসনের অবসান ঘটে। দেব রাজবংশ নামে একটি বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। আদাবাড়ি তাম্র শাসনে এই বংশের দশরথ দেব নামক একজন রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়।

এই দেব বংশই বংগ–সমতট রাজ্যের শেষ হিন্দুরাজ বংশ।

ঋণ স্বীকার ঃ

১. প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড সুনীল চট্টোপাধ্যায়
২. বাংলাদেশের ইতিহাস, ডঃ মুহাম্মদ আবদুর রহীম প্রমুখ
৩. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ড. এম. এম. রহীম
৪. হিষ্ট্রি অব দ্যা মুসলিমস অব বেংগল, ড. মুহাম্মাদ মোহর আলী
৫. ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস, এ.কে.এম. আবদুল আলীম।

বাংলাদেশে ইসলামের আগমন

এক

প্রাক-ইসলাম যুগ থেকেই আরব বণিকগণ বাণিজ্যের জন্য লোহিত সাগর, আরব সাগর এবং ভারত মহাসাগরের তীরবর্তী বন্দরগুলোতে আসা-যাওয়া করতেন।

আরব দেশের বণিকেরা বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় বন্দরগুলোতে এসে চন্দন কাঠ, হাতীর দাঁত, মসলা এবং সূতী কাপড় ক্রয় করতেন এবং জাহাজ বোঝাই করে নিজেদের দেশে নিয়ে যেতেন।

ভারতের বিশিষ্ট ইসলামী গবেষক সাইয়েদ সুলাইমান নদবী তাঁর লিখিত গ্রন্থ 'আরবোঁ কি জাহাজরানী'-তে লিখেন যে মিসর থেকে সুদূর চীন পর্যন্ত প্রলম্বিত দীর্ঘ নৌ-পথে আরবগণ যাতায়াত করতেন। মালাবার উপকূল হয়ে তাঁরা চীনের পথে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করতেন।[১]

বাংলাদেশের বিশিষ্ট ইসলামী গবেষক মাওলানা আকরাম খাঁ তাঁর রচিত 'মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেন যে আরব বণিকগণ এই পথ ধরেই বাংলাদেশ ও কামরূপ (আসাম) হয়ে চীনে যাতায়াত করতেন। মালাবার ছিলো মধ্য পথের প্রধান বন্দর।[২] বঙোপসাগরে প্রবেশের পূর্বে তাঁরা মাদ্রাজ উপকূলেও নোঙর করতেন বলে মনে হয়।

দীর্ঘপথে পালে-টানা জাহাজের একটানা সফর সম্ভবপর ছিলোনা। পথে যেইসব মানযিল ছিলো সেইগুলিতে আবশ্যিকভাবে থেমে জাহাজ মেরামত এবং পরবর্তী মানযিলের জন্য রসদ সংগ্রহ করতে হতো।[৩]

দুই

মুহাদ্দিস ইমাম আবাদান মারওয়াযীর গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবী আবু ওয়াক্কাস মালিক ইবনু ওহাইব (রা) নবুওয়াতের পঞ্চম সনে (অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৬১৫ সনে) হাবশায় (ইথিওপিয়ায়) হিজরাত করেন। নবুওয়াতের সপ্তম সনে (অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৬১৭ সনে) তিনি কায়েস ইবনু হুযাইফা (রা), উরওয়াহ ইবনু আছাছা (রা), আবু কায়েস ইবনুল হারিস (রা) এবং কিছু সংখ্যক হাবশী মুসলিমসহ দুইটি জাহাজে করে চীনের পথে সমুদ্র পাড়ি দেন।[৪]

শায়খ যাইনুদ্দীন তাঁর রচিত গ্রন্থ 'তুহফাতুল মুজাহিদীনে' লিখেন যে ভারতের তামিল ভাষার প্রাচীন গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে একদল আরব জাহাজে চড়ে মালাবার এসেছিলেন। তাঁদের প্রভাবে রাজা চেরুমল পেরুমল ইসলাম গ্রহণ

করেন। অতপর মাক্কায় গিয়ে তিনি কিছুকাল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) সান্নিধ্যে থাকেন।[৫]

আবু ওয়াক্কাস মালিক ইবনু ওহাইব (রা) দীর্ঘ নয় বছর সফরে ছিলেন।

মালাবার বা চেরর রাজা চেরুমল পেরুমল তাঁর কাছেই ইসলামের দাওয়াত পেয়েছিলেন বলে প্রতীয়মান হয়।

চীন যাবার পথে তাঁকে বাংলাদেশের বন্দরগুলোতেও নোঙর করতে হয়েছে। আর তাঁর পবিত্র সাহচর্যে এসে বাংলাদেশের কিছু সংখ্যক মানুষ নিশ্চয়ই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তবে কারা ছিলেন সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি তা আমাদের জানা নেই।

চীনের মুসলিমদের বই পুস্তক থেকে জানা যায় যে আবু ওয়াক্কাস মালিক ইবনু ওহাইব (রা) তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে খৃষ্টীয় ৬২৬ সনে চীনে পৌছেন।[৬]

আবু ওয়াক্কাস মালিক ইবনু ওহাইব (রা) ক্যান্টন বন্দরে অবস্থান করেন। সমুদ্র তীরের কোয়াংটা মাসজিদ তিনিই নির্মাণ করেন। মাসজিদের নিকটেই রয়েছে তাঁর কবর। দুইজন সাহাবীর কবর রয়েছে চুয়ান-চু বন্দরের নিকটবর্তী লিং পাহাড়ের ওপর। চতুর্থজন দেশের অভ্যন্তর ভাগে চলে যান।[৭]

এই সব তথ্য প্রমাণ করে যে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) যুগেই চীনে সর্বপ্রথম ইসলাম পৌছে এবং তা পৌছে একদল খাঁটি আরব মুসলিমের নেতৃত্বে। যাঁরা বাংলাদেশের বন্দরগুলোতে নোঙর করে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করে চীন অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন তাঁরা বাংলাদেশেও অবশ্যই ইসলাম প্রচার করেছেন। আর তা যদি হয়ে থাকে তাহলে খৃষ্টীয় সপ্তম শতকেই বাংলাদেশে প্রথম ইসলামের আগমন ঘটে।

তিন

আরব ভূগোলবিদ আবুল কাসিম উবাইদুল্লাহ ইবনু খুরদাধবিহ (৯১২ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু) বলেন যে সরন্দীপ (শ্রীলংকা) এবং গোদাবরী নদী পেরিয়ে এগিয়ে গেলে সমন্দর নামে একটি বন্দর রয়েছে যার আশেপাশে প্রচুর ধান উৎপন্ন হয়। তিনি আরো জানান যে এই বন্দরে কামরূপ (আসাম) থেকে মিষ্টি পানির পথে পনর/বিশ দিনে নৌকাযোগে চন্দন কাঠ আনা হয়।[৮] আরব ভূগোলবিদ আবু আবদিল্লাহ আলইদরিসী ও এই বন্দরের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে এটি একটি বড়ো বন্দর এবং কামরূপ থেকে নদীপথে কাঠ এনে এখানে বিক্রয় করা হয়। তিনি আরো জানান যে এই বন্দরটি একটি বড়ো নদীর মোহনায় অবস্থিত।[৯] এইসব বর্ণনা ইংগিত বহন করে যে মেঘনা তীরের চাঁদপুরই ছিলো সেই

নদীবন্দর যেখানে আরব বণিকগণ প্রধানত চন্দন কাঠের জন্য আসতেন।

আবু আবদিল্লাহ আলইদরিসী লিখেছেন যে বাগদাদ ও বাসরাহ থেকে আরব বণিক এবং পর্যটকগণ মেঘনার মোহনার সন্নিকটস্থ অঞ্চলে আসা-যাওয়া করতেন।

আরব ভূগোলবিদ আবুল কাসিম উবাইদুল্লাহ ইবনু খুরদাধবিহ লিখেন যে সরন্দ্বীপের পর জাজিরাতুর-রামি নামক একটি ভূখন্ড আছে।[১১]

আরব ভূগোলবিদ আল মাসউদী উল্লেখ করেন যে ভারত সাগরের তীরে নদী বিধৌত একটি দেশ রয়েছে।[১২]

আরব ভূগোলবিদ ইয়াকুত ইবনু আবদিল্লাহ বলেন যে এই ভূ-খন্ডটি মালাক্কার দিকে ভারতের দূরতম অঞ্চল।[১৩]

একসময় চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে রামি বা রামু নামে একটি রাজ্য ছিলো। সুলাইমান নামক একজন আরব বণিক বলেন যে রামির রাজার পঞ্চাশ হাজার হাতী এবং পনর হাজার সৈন্য ছিলো।[১৪]

এইসব তথ্য ইংগিত বহন করে যে আরব ভূগোলবিদগণ জাজিরাতুর রামি নামে যেই ভূ-খন্ডের উল্লেখ করেছেন তা চট্টগ্রাম-কক্সবাজার-পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলই ছিলো। কক্সবাজারের সমুদ্র সন্নিকটবর্তী আজকের রামু সেই রাজ্যেরই একটি ক্ষুদ্রাংশ। আরব ভূগোলবিদগণের বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে আরব বণিকগণ তাদের বাণিজ্য জাহাজ নিয়ে চট্টগ্রাম আসতেন এবং মসলা, হাতীর দাঁত ইত্যাদি সামগ্রী সংগ্রহ করতেন।

চার

৭৫০ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে পালবংশের রাজত্ব শুরু হয়। পালগণ বৌদ্ধ ছিলেন। পাল বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন ধর্মপাল। তিনি ৭৭০ খৃষ্টাব্দ থেকে ৮১০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজ্য শাসন করেন।

ধর্মপাল পাঞ্জাবের উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করে কান্যকুব্জে অভিষেক অনুষ্ঠান করেন। এই অনুষ্ঠানে ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তি, গান্ধার এবং কীর রাজ্যের রাজাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ইতিহাসবিদ রমেশ চন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেন যে যবন রাজ্যটি সম্ভবত সিন্ধু নদীর তীরবর্তী কোন মুসলিম অধিকৃত রাজ্য হবে।[১৫]

ইতিহাসবিদ রমেশ চন্দ্র মজুমদারের উক্তি থেকে বুঝা যায় যে খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের শেষভাগ এবং নবম শতকের প্রথম ভাগে সিন্ধু নদীর তীরবর্তী আরব মুসলিম শাসিত এক বা একাধিক রাজ্যের সাথে পাল শাসিত বাংলাদেশের যোগাযোগ ছিল।

আগেই বলেছি যে খৃষ্টীয় ৭৫০ সনে বাংলাদেশে পাল বংশের রাজত্ব শুরু হয়। আর খৃষ্টীয় ৭৫০ সনেই বাগদাদে বানুল আব্বাস খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত হয়।

ধর্মপাল যখন বাংলাদেশের শাসক তখন বাগদাদের শাসক ছিলেন হারুনুর রশীদ।

রাজশাহীর পাহাড়পুরে বৌদ্ধ বিহার খননকালে একটি আরবী মুদ্রা পাওয়া যায়। এই মুদ্রাটি তৈরী হয়েছে ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ হারুনুর রশীদের শাসনকালে।[১৬]

কুমিল্লা জিলার ময়নামতিতে অনুরূপ খননকার্য কালে বানুল আব্বাস যুগের দুইটি মুদ্রা পাওয়া যায়।[১৭]

এইসব মুদ্রাপ্রাপ্তি এই কথাই প্রমাণ করে যে খৃষ্টীয় নবম শতকে বাংলাদেশে আরব মুসলিমদের যাতায়াত ছিলো।

পাঁচ

বাংলাদেশের সন্নিকটে বংগোপসাগরের তীরে রয়েছে আরাকান। এক সময় এটি বড়ো একটি রাজ্য ছিলো।

আরাকানের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে রাজা মা-বা তুইঙ (Ma-ba-toing) ৭৫০ খৃষ্টাব্দ থেকে ৮১০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দেশ শাসন করেন।

উল্লেখ্য যে ঐ সময় বাংলাদেশের শাসক ছিলেন বৌদ্ধ রাজা ধর্মপাল। আর বাগদাদকেন্দ্রিক বিশাল বানুল আব্বাস খিলাফাহর শাসক ছিলেন হারুনুর রশীদ।

রাজা মা-বা-তুইঙ-এর শাসনকালে আরব মুসলিমদের কয়েকটি জাহাজ সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়ে আরাকান উপকূলের নিকটে বিধ্বস্ত হয়। যাত্রীদের মধ্যে যাঁরা জীবিত ছিলেন তাঁরা রামরী দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখান থেকে তাঁরা আরাকানের মূল ভূ-খন্ডে পৌছে রাজার সাথে সাক্ষাত করেন। তাঁদের আলাপ ও আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে রাজা তাঁদের বসবাসের জন্য কয়েকটি গ্রাম নির্দিষ্ট করে দেন। আরব মুসলিমগণ ঐ গ্রামগুলোতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন।[১৮]

আরাকানের ঐতিহাসিক দলীল থেকে জানা যায় যে রাজা Tsu-la-Taing-Tsan-da-ya ৯৫১ খৃষ্টাব্দ থেকে ৯৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আরাকান শাসন করেন।

তাঁর রাজত্বকালে একজন থু-রা-তান (Thu-ra-tan) কে পরাজিত করে তিনি Tset-ta-going (চাটিগাঁও) নামক স্থানে একটি বিজয় স্তম্ভ নির্মাণ করেন।

গবেষকদের মতে থু-রা-তান শব্দটি আরবী শব্দ সুলতান-এর পরিবর্তিত রূপ।[১৯]

এথেকে এটি প্রমাণিত হয় যে, খৃষ্টীয় দশম শতকে চট্টগ্রাম অঞ্চলে মুসলিম জনপদ গড়ে উঠে এবং মুসলমানদের নেতা এতোখানি শক্তিধর হয়ে উঠে যে আরাকান-রাজ তাঁর বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য হন।

ছয়

ইসলামের সোনালী যুগের এবং তার নিকটবর্তী যুগের মুসলমানগণ যেই উদ্দেশ্যে যেখানেই যেতেন না কেন তাঁরা ইসলামী জীবনদর্শনের মর্মকথা মানুষের সামনে উপস্থাপন করার কোন সুযোগ হাতছাড়া করতেন না। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য যেইসব মুসলিম বাংলাদেশে এসেছিলেন তাঁরাও নিশ্চয়ই মুবাল্লিগ হিসেবে তাঁদের কর্তব্য পালন করেছেন। তবে তাঁদের তৎপরতা ও প্রভাব সম্পর্কে তথ্য অনুপস্থিত।

আবার, ব্যবসা-বাণিজ্য নয়, শুধুমাত্র ইসলাম প্রচারের জন্যই এসেছেন অনেকেই। তাঁদের ব্যাপারেও ইতিহাস নীরব। তবে কিছু সংখ্যক মুবাল্লিগের ব্যাপারে ইতিহাস নীরব থাকতে পারেনি।

মধ্য এশিয়ার বালখের শাসক শাহ মুহাম্মাদ সুলতান বালখী রাজ্য শাসন ত্যাগ করে দিমাস্‌ক্‌ এসে তাওফীক নামক একজন নেক লোকের সান্নিধ্যে থাকেন বহু বছর। উক্ত ব্যক্তি তাঁকে বাংলাদেশে এসে ইসলাম প্রচারে উৎসাহিত করেন।

শাহ মুহাম্মদ সুলতান বালখী নৌ-পথে সন্দ্বীপ পৌছেন। অতপর নৌ-পথে তিনি আসেন হিন্দু রাজা বলরামের রাজ্য হরিরামনগর। সম্ভবত মানিকগঞ্জ জিলার হরিরামপুরই সেই কালের হরিরামনগর। রাজা বলরাম একজন মুসলিম মুবাল্লিগের উপস্থিতি বরদাশত করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি তাঁর সৈন্যসামন্ত নিয়ে শাহ মুহাম্মদ সুলতান বালখী ও তাঁর সংগীদের ওপর চড়াও হন। শাহ মুহাম্মদ সুলতান বালখীও আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন। সংঘর্ষে রাজা নিহত হন। রাজার মন্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করেন। শাহ মুহাম্মদ সুলতান বালখী এই নও মুসলিম মন্ত্রীকেই সিংহাসনে বসান।

এরপর তিনি রাজা পরশুরামের রাজ্য (বগুড়ার) মহাস্থানে আসেন। রাজার বোন শিলাদেবী তন্ত্রমন্ত্র প্রয়োগ করে শাহ মুহাম্মাদ সুলতান বালখীকে তাড়াবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। রাজা পরশুরাম সুলতান বালখী ও তাঁর সংগীদের ওপর সশস্ত্র হামলা চালান। যুদ্ধে তিনি নিহত হন। পরে তাঁর মন্ত্রীও যুদ্ধ চালিয়ে প্রাণ হারান। শিলাদেবী কালী মন্দিরে আশ্রয় নেন। পরে করতোয়া নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

রাজকুমারী রত্নমনি বন্দী হন। মুসলিমদের কথা ও আচরণ তাঁকে মুগ্ধ করে। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। নিহত রাজা পরশুরামের সেনাপতি সুরখাবও ইসলাম গ্রহণ করেন। শাহ মুহাম্মাদ সুলতান বালখীর উদ্যোগে সুরখাব ও রত্নমনির বিয়ে সুসম্পন্ন হয়।[২০]

মহাস্থানে শাহ মুহাম্মাদ সুলতান বালখী মাসজিদ ও ইসলামী শিক্ষালয় স্থাপন করেন। নিকটবর্তী অঞ্চলে তিনি ইসলাম প্রচার করতে থাকেন।

খৃষ্টীয় একাদশ শতকের মধ্যভাগে বাংলাদেশের নেত্রকোনা অঞ্চলে এসেছিলেন একজন বিশিষ্ট মুবাল্লিগ। তাঁর নাম শাহ মুহাম্মাদ সুলতান রুমী। একটি ঐতিহাসিক সূত্র থেকে জানা যায় যে ১০৫৩ সনেও তিনি জীবিত ছিলেন।

একদল সংগী নিয়ে তিনি মদনপুর নামক স্থানে পৌঁছেন। এটি ছিলো তখন একজন কোচ রাজার শাসনাধীন। কোচ রাজা প্রথমে তাঁর প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করেন। পরে তাঁর মনোভাব পরিবর্তিত হয়। কোচ রাজা শাহ মুহাম্মাদ সুলতান রুমীকে মদনপুর গ্রামটি দান করেন। এখানে অবস্থান করে শাহ মুহাম্মাদ সুলতান রুমী ইসলাম প্রচার করতে থাকেন।[২১]

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের গোড়ার দিকে বিক্রমপুরে (যার একাংশ মুনশীগঞ্জ জিলায় শামিল) একদল সংগী নিয়ে আদম নামক একজন মুবাল্লিগ এসেছিলেন। এই স্থানটি তখন বল্লাল সেন নামক একজন রাজার শাসনাধীন ছিলো।

আদম সাথীদেরকে নিয়ে এক স্থানে তাঁবু স্থাপন করে খাওয়ার জন্য একটি গরু জবাই করেন। একটি কাক গরুর গোসতের একটি টুকরা নিয়ে উড়ে যায়। আরেকটি কাকের তাড়া খেয়ে কাকটি গরুর গোসতের টুকরাটি ফেলে দেয়। রাজা বল্লাল সেনের সৈন্যদের একটি ক্যাম্পে গোসতের টুকরাটি পড়ে। সৈন্যরা বিষয়টি রাজাকে জানায়। হিন্দুরাজা বল্লাল সেন রাগান্বিত হন এবং মুবাল্লিগ গ্রুপটির ওপর হামলা করার জন্য একদল সৈন্য পাঠান। আদমের নেতৃত্বে মুবাল্লিগগণ আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধে নামতে বাধ্য হন। চৌদ্দ দিন পর্যন্ত লড়াই চলে। পঞ্চদশ দিবসে রাজা নিজে রণাংগনে আসেন।

চৌদ্দ দিন যুদ্ধ চলাতে রাজা বিজয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন না। তিনি রাজধানীতে একটি অগ্নিকুন্ড প্রস্তুত করালেন এবং মহিলাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে তিনি পরাজিত হয়েছেন জানতে পেলে তারা যেন অগ্নিকুন্ডে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুবরণ করে। তিনি তার পোষাকের নীচে একটি কবুতর লুকিয়ে নিলেন। বলে গেলেন যে কবুতরটি উড়ে এলে বুঝতে হবে যে যুদ্ধে তিনি পরাজিত হয়েছেন।

রাজার প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে মুসলিমগণ একে একে প্রাণ হারাতে থাকেন। অবশেষ আদমও শাহাদাত বরণ করেন। এটি ছিলো ১১১৯ সনের ঘটনা। রামপাল গ্রামে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

রাজা পুকরে নেমে রক্ত রঞ্জিত পোষাক ধুতে থাকেন। হঠাৎ কবুতরটি পোষাকের নীচ থেকে বেরিয়ে রাজপ্রাসাদের দিকে উড়ে যায়। তার আগমনে রমণীকূল অগ্নিকুন্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃত্যু বরণ করে।

দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে রাজা ছুটলেন রাজপ্রাসাদের দিকে। এসে দেখেন সবাই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। শোকের প্রাবল্যে তিনিও ঝাঁপ দিলেন সেই অগ্নিকুণ্ডে।[২২]

মনে হয় স্থানীয় লোকদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক মুসলিম ছিলেন। তাঁরা শহীদ আদম এবং তাঁর সাথীদের মৃতদেহ কবরস্থ করেন। অমুসলিমদের তো মুসলিমদের মৃতদেহ দাফন করার পদ্ধতি জানা থাকার কথা নয়।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষ দিকে শাহ মাখদূম রূপোস নামে একজন মুবাল্লিগ আসেন রাজশাহী অঞ্চলে। খৃষ্টীয় ১১৮৪ সনেও তিনি সেখানে ছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐ অঞ্চলে তিনিই ছিলেন ইসলামের প্রথম মুবাল্লিগ। রামপুর নামক গ্রামে তিনি অবস্থান গ্রহণ করেন। তাঁর পবিত্র চরিত্র ও সুন্দর ব্যবহার লোকদেরকে আকৃষ্ট করে। তাঁর সান্নিধ্যে এসে লোকেরা ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান হাছিল করতো। ইসলাম সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করে বহু অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেন। পরিবার থেকে বিতাড়িত হয়ে কিংবা তাঁর সান্নিধ্যে থাকার আকর্ষণে বহু নও মুসলিম রামপুর গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তাঁদের সংখ্যা এতো বেশি হয় যে রামপুর গ্রামে আর ঠাঁই মিলছিলো না। তাই পার্শ্ববর্তী গ্রাম বোয়ালিয়াতেও তাঁরা বসবাস করতে শুরু করেন।

রামপুর–বোয়ালিয়া বাস্তবে ইসলামী লোকালয়ে পরিণত হয়। উল্লেখ্য যে এই রামপুর–বোয়ালিয়াকে ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে গড়ে উঠে রাজশাহী শহর।

সাত

বাংলাদেশে পাল বংশের শাসন এক সময় দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সময়টিতে দক্ষিণ ভারত থেকে আগত সেনগণ বৌদ্ধ পালদেরকে পরাজিত করে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের গোড়ার দিকে (১১২৫ খৃষ্টাব্দে) বিজয় সেন নদীয়াকেন্দ্রিক রাজ্যের অধিপতি হন। বিজয় সেনের পুত্র ছিলেন বল্লাল সেন। আর বল্লাল সেনের পুত্র ছিলেন লক্ষণ সেন। উত্তরে গৌড় এবং পূর্বে বিক্রমপুর পর্যন্ত তাঁদের রাজ্য বিস্তৃত ছিলো।

সেনগণ গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। তাঁরা পালদেরকে উৎখাত করেন। প্রজাগণের ওপর হিন্দুত্ব চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা চালান। কৌলিণ্য প্রথা প্রবর্তন করে তাঁরা সমাজে অনৈক্য সৃষ্টি করেন।

সেন রাজদের রাজত্বকালেও বাংলাদেশে মুসলিমদের যাতায়াত ছিলো।

ইতিহাসবিদ মিনহাজুদ্দীন সিরাজ রচিত তাকাকাত-ই-নাসিরী গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে বিক্রয়ের জন্য উন্নত জাতের ঘোড়া নিয়ে মুসলিম বণিকগণ স্থল পথে নদীয়া (বর্তমানে এটি পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত) এবং অন্যান্য স্থানে আসতেন।[২৩]

আট

এইসব তথ্য সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে আরব বণিক এবং মুবাল্লিগদের মাধ্যমেই বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ইসলামের আলো পৌছে। পরবর্তীকালে অনারব অঞ্চল থেকেও মুসলিমগণ এই দেশে আসতে থাকেন।

মুসলিম বণিক এবং মুবাল্লিগদের উপস্থাপিত শিক্ষা ও আচরণ স্থানীয় লোকদের একাংশকে মুগ্ধ করে। তাঁরা ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে মুসলিম হন। এইভাবেই বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে মুসলিম লোকালয় গড়ে ওঠে।

তথ্যসূত্র

১-৫. বাংলাদেশে ইসলাম ঃ কয়েকটি তথ্যসূত্র, মুহীউদ্দীন খান, মাসিক মদীনা, জানুয়ারী, ১৯৯২, পৃষ্ঠা-৪১

৬. ঐ, পৃষ্ঠা-৪০

৭. ঐ, পৃষ্ঠা-৪০

৮. হিষ্ট্রি অব দ্যা মুসলিমস অব বেঙ্গল, ডঃ মুহাম্মাদ মোহর আলী, পৃষ্ঠা-৩০

৯. ঐ

১০. বাংলাদেশ ডিষ্ট্রিক্ট গ্যাজেটিয়ারস ঃ চট্টগ্রাম, পৃষ্ঠা-৬১

১১. হিষ্ট্রি অব দ্যা মুসলিমস অব বেঙ্গল, ডঃ মুহাম্মাদ মোহর আলী, পৃষ্ঠা-৩৫

১২. ১৪. ঐ, পৃষ্ঠা-৩৫

১৫. বাংলাদেশের ইতিহাস ঃ প্রাচীন যুগ, রমেশ চন্দ্র মজুমদার, পৃষ্ঠা-৪৩, ৪৪

১৬-১৭. হিষ্ট্রি অব দ্যা মুসলিমস অব বেঙ্গল, ডঃ মুহাম্মাদ মোহর আলী, পৃষ্ঠা-৩৬

১৮. চট্টগ্রামে ইসলাম, ডঃ আবদুল করীম, পৃষ্ঠা-১৫, ১৬

১৯. হিষ্ট্রি অব দ্যা মুসলিমস অব বেঙ্গল, ডঃ মুহাম্মাদ মোহর আলী, পৃষ্ঠা-৩৮

২০. এ হিষ্ট্রি অব সুফীজম ইন বেঙ্গল. ডঃ এনামুল হক, পৃষ্ঠা-২০৮

২১. বাংলাদেশে ইসলাম, আবদুল মান্নান তালিব, পৃষ্ঠা-৬৯

২২. এ হিষ্ট্রি অব সুফীজম ইন বেঙ্গল, ডঃ এনামুল হক, পৃষ্ঠা-২১১

২৩. হিষ্ট্রি অব দ্যা মুসলিমস অব বেঙ্গল, ডঃ মুহাম্মাদ মোহর আলী, পৃষ্ঠা-৪২

বাংলাদেশে মুসলিম শাসন

বাংলাদেশের মুসলিমদের রয়েছে এক সমৃদ্ধ ইতিহাস। প্রথম পর্যায়ে মুসলিমগণ এই দেশ শাসন করেছিলেন একাধারে পাঁচশত চুয়ান্ন বছর।

এই নিবন্ধে আমরা অতি সংক্ষেপে মুসলিম শাসন কালের ভুলে যাওয়া ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

১. ইখতিয়ারউদ্দীন মুহাম্মাদ বাখতিয়ার খালজী

ইখতিয়ারউদ্দীন মুহাম্মাদ বাখতিয়ার খালজী ছিলেন বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের স্থপতি।

ইখতিয়ারউদ্দীন মুহাম্মাদ উত্তর আফগানিস্তানের একটি জনপদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বেঁটে। তাঁর হাত দুইটি ছিলো বেশ লম্বা। তাঁর চেহারা আকর্ষণীয় ছিলো না। তবে তিনি ছিলেন একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি।

খৃষ্টীয় ১১৯৩ সনে তিনি ভারতে আসেন। দিল্লীতে তখন কুত্‌বুদ্দীন আইবেকের শাসন। তিনি উত্তর ভারতের বাদায়ূনে এসে সেনাপতি মালিক হিযবারুদ্দীনের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। অতপর তিনি অযোধ্যা এসে গভর্ণর মালিক হুসামুদ্দীনের সুনজরে পড়েন ও মির্যাপুর জিলায় একটি জাগীর লাভ করেন।

ইখতিয়ারউদ্দীন মুহাম্মাদ তুর্ক মুসলিমদেরকে নিয়ে একটি সৈন্যদল গড়ে তোলেন। এর সাহায্যে তিনি নিকটতম অঞ্চলগুলো জয় করতে শুরু করেন।

খৃষ্টীয় ১২০২ সনে ইখতিয়ারউদ্দীন মুহাম্মাদ বিহারের দিকে অগ্রসর হন। তখন বিহারের নাম ছিলো মগধ। উদন্তপুরী ছিলো মগধের রাজধানী। তিনি সসৈন্যে উদন্তপুরী পৌঁছে তা জয় করেন। তখন থেকে মগধ বিহার নামে অভিহিত হতে থাকে।

খৃষ্টীয় ১২০৩ সনে দিল্লীর সুলতান কুত্‌বুদ্দীন আইবেক বাদায়ূন সফরে আসেন। ইখতিয়ারউদ্দীন মুহাম্মাদ বাদায়ূনে গিয়ে সুলতানের সাথে সাক্ষাত করেন। কুতবুদ্দীন আইবেক তাঁকে গৌড় বা লক্ষণাবতী জয় করতে উদ্বুদ্ধ করেন। লক্ষণাবতীতে তখন ছিলো হিন্দু সেন বংশের শাসন।

সেনদের পূর্ব পুরুষ সামন্ত সেন দক্ষিণ ভারতের কর্ণাট থেকে এসে পশ্চিম বঙের বর্ধমান অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্ত সেন রাঢ় অঞ্চলে একটি ছোট্ট রাজ্য গড়ে তোলেন। হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেন রাঢ় রাজ্যের

বিস্তৃতি ঘটান। বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন এই রাজ্য আরো সুসংহত করেন। বল্লাল সেনের পুত্র ছিলেন লক্ষণ সেন।

সেনগণ ছিলেন উগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদী, সাম্প্রদায়িক, পরমত বিদ্বেষী ও অত্যাচারী। তাঁরা বৌদ্ধ প্রজাদের উপর সীমাহীন নির্যাতন চালান। লক্ষণ সেন শাসিত গৌড় বা লক্ষণাবতী রাজ্যের রাজধানী ছিলো নদীয়া ও লক্ষণাবতী।

খৃষ্টীয় ১২০৩ সনে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মাদ তাঁর অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে গৌড় রাজ্য অভিমুখে রওয়ানা হন। তিনি এতো দ্রুততার সাথে চলছিলেন যে তাঁর অশ্বারোহী সৈন্যরাও তাঁর সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারছিলো না। তিনি যখন নদীয়া শহরে পৌঁছেন তখন তাঁর সাথে ছিলেন মাত্র আঠার জন অশ্বারোহী।

ইখতিয়ারউদ্দীন মুহাম্মাদ ছিলেন অসীম সাহসের অধিকারী। আঠার জন যোদ্ধা নিয়েই তিনি রাজ-প্রাসাদের দিকে এগিয়ে চলেন। অতর্কিত হামলা চালিয়ে তিনি রক্ষীদেরকে পরাস্ত করে প্রাসাদে ঢুকে পড়েন। ভীত-বিহ্বল হিন্দু সৈন্যরা চীৎকার করতে থাকে। রাজা লক্ষণ সেন দুপুরের খাওয়া খেতে বসেছিলেন। মুসলিমদের আগমনের খবর পাওয়ার সাথে সাথে তিনি খালি পায়ে প্রাসাদের পেছন দরওয়াজা দিয়ে পালিয়ে যান। অবশেষে বংগ রাজ্যের বিক্রমপুরে এসে তিনি অবস্থান গ্রহণ করেন।

ইখতিয়ারউদ্দীন মুহাম্মাদ নদীয়া দখলের কয়েকদিন পর গৌড় বা লক্ষণাবতী আসেন।

ইখতিয়ারউদ্দীন মুহাম্মাদ বাখতিয়ার খালজীর নেতৃত্বে মুসলিম শাসন কায়েম হওয়ার পর গৌড় রাজ্য প্রধানতঃ লাখনৌতি নামে আখ্যায়িত হতে থাকে।

ইখতিয়ারউদ্দীন মুহাম্মাদ লাখনৌতি রাজ্যকে তিনটি প্রধান প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত করেন। অযোধ্যার মির্যাপুর জিলা, দক্ষিণ বিহার (মগধ) ও উত্তর বিহারের (মিথিলা) কিছু অংশ নিয়ে গঠিত ছিলো পশ্চিম অঞ্চল। এই অঞ্চলের প্রশাসক নিযুক্ত হন হুসামুদ্দীন আইওয়াদ খালজী। বীরভূমের লাখনূরকে কেন্দ্র করে গঠিত ছিলো দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল। এই অঞ্চলের প্রশাসক নিযুক্ত হন মুহাম্মাদ শিরান খালজী। রাজমহল (বর্তমানে বিহারের অন্তর্ভুক্ত), মালদহ, দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী, বগুড়া, যশোরের কিয়দংশ ও নদীয়া নিয়ে গঠিত ছিলো উত্তর-পূর্ব অঞ্চল। এই অঞ্চলের প্রশাসক নিযুক্ত হন আলী মারদান খালজী।

আঞ্চলিক প্রশাসকগণ আইন-শৃংখলা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যথারীতি রাজস্ব আদায় শুরু করেন। ইখতিয়ারউদ্দীন মুহাম্মাদ একজন দীনদার ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নিজেই কয়েকটি মাসজিদ ও ইসলামী শিক্ষালয় স্থাপন করেন। তাঁর পদাংক অনুসরণ করেন আঞ্চলিক প্রশাসকগণ। তাঁরাও মাসজিদ নির্মাণ ও ইসলামী শিক্ষালয় স্থাপন করতে থাকেন।

আভ্যন্তরীণভাবে লাখনৌতিকে সুসংহত করার পর ইখতিয়ারউদ্দীন মুহাম্মাদ তিব্বত রাজ্য-জয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। প্রথমে গৌড় বা লক্ষণাবতী শহরে ছিলো তাঁর রাজধানী। পরে তিনি দিনাজপুর জিলার দেওকোট নামক স্থানে একটি সেনানিবাস গড়ে তোলেন। তখন থেকে দেওকোটই হয় লাখনৌতি রাজ্যের রাজধানী। এখানে অবস্থান গ্রহণ করে তিনি তিব্বত অভিযানের প্রস্তুতি নেন। তিনি দশ হাজার তুর্ক মুসলিম নিয়ে একটি অশ্বারোহী বাহিনী গড়ে তোলেন।

খৃষ্টীয় ১২০৬ সনে তিনি সসৈন্যে দেওকোট থেকে রওয়ানা হন। প্রথমে তিনি পৌঁছেন কুচবিহার। এই অঞ্চলে তখন মেচ, কুচ, থারো ও থিহারো উপজাতি বসবাস করতো। তিনি তাদের সাথে মেলামেশা শুরু করেন। তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে মেচ উপজাতির প্রধান ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর নাম রাখা হয় আলী মেচ। তাঁর মাধ্যমে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মাদ অন্যান্য উপজাতির প্রধানদেরও সহযোগিতা লাভ করেন।

কুচবিহারে কিছুকাল অবস্থানের পর তিনি কামরূপের (আসাম) পথে অগ্রসর হন। আলী মেচ পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেন। ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর তীর ধরে তাঁরা সামনে অগ্রসর হতে থাকেন। আসামের গৌয়াহাটির নিকট দিয়ে প্রবাহিত বারনাদি নদীর ওপর ছিলো পাথরের তৈরি একটি পুল। আলী মেচ এই পুল পর্যন্ত ইখতিয়ারউদ্দীন মুহাম্মাদকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসেন। অতপর তিনি কুচবিহার ফিরে যান।

ইখতিয়ারউদ্দীন মুহাম্মাদ পুলের ওপর দিয়ে বারনাদি নদী পেরিয়ে যান। তাঁর গন্তব্যস্থল তখনো বহু দূর। তবে একজন দূরদর্শী সমর বিশারদ হিসেবে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর সৈন্যদের গমনপথের এই পুলটি নিরাপদ রাখা প্রয়োজন। তাই তিনি কিছুসংখ্যক সৈন্যকে এইপুল পাহারা দেয়ার জন্য রেখে যান।

আসাম-রাজ লাখনৌতির এই শক্তিধর শাসকের প্রতি বন্ধুসুলভ মনোভাব প্রদর্শন করেন।

আঁকাবাঁকা দুর্গমপথে পাহাড়ের চড়াই উৎরাই পেরিয়ে বীর যোদ্ধাদেরকে নিয়ে সামনে অগ্রসর হতে থাকেন ইখতিয়ারউদ্দীন মুহাম্মাদ। হিমালয় পর্বতের পূর্ব কিনারা ধরে তিনি পনর দিন পর্যন্ত পথ চলেন। ষোলতম দিনে তিনি পৌঁছেন তিব্বত সীমান্তে।

তিব্বত-রাজ একটি দক্ষ সেনাদল এখানে মোতায়েন রেখেছিলেন। দীর্ঘ পাহাড়ী পথ অতিক্রম করে মুসলিম সৈনিকগণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের মনোবল ছিলো অটুট। তাঁরা তিব্বত বাহিনীর সাথে যুদ্ধ শুরু করেন। কিন্তু তিব্বত

বাহিনীকে পিছে হটিয়ে দেয়া সম্ভব হলো না। লাখনৌতি বাহিনী আর অগ্রসর হতে পারছিলোনা। এমতাবস্থায় অচেনা পাহাড়ী অঞ্চলে অবস্থান করাটাও ছিলো বিপজ্জনক। তাই ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মাদ ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নেন।

ইখতিয়ারউদ্দীন মুহাম্মাদ তিব্বত বাহিনীকে পরাজিত করতে পারেননি, এই খবর শুনে কামরূপ রাজ তাঁর মনোভাব পরিবর্তন করেন। তিনি মিত্রতার পথ পরিহার করে শত্রুতার পথ বেছে নেন। তাঁর নির্দেশে কামরূপের সৈন্যরা বারনাদি নদীর ওপরে অবস্থিত পাথরের পুল পাহারায় নিযুক্ত মুসলিম সৈন্যদের ওপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে তাদেরকে হত্যা করে। তারা পাথরের পুলটি ভেংগে ফেলে।

গৌয়াহাটির নিকটে পৌঁছে ইখতিয়ারউদ্দীন মুহাম্মাদ নাজুক অবস্থার সম্মুখীন হন। পুল ভেংগে দেয়া হয়েছে। সামনে খরস্রোতা বারনাদি নদী। সৈন্যগণ ক্লান্ত-শ্রান্ত। নদী পাড়ি দেয়ার বিকল্প কোন ব্যবস্থা নেই।

এবারও এক দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত নিলেন লাখনৌতির অধিপতি। ঘোড়ার পিঠে বসেই খরস্রোতা নদী পার হতে হবে। তিনি সৈন্যদেরকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন নদীতে। নদীর খরস্রোতের সাথে লড়াই করে এগুতে পারেনি ঘোড়াগুলো। ঘোড়াসহ সৈন্যগণ পানিতে ডুবে প্রাণ হারান। দশহাজার অশ্বারোহী প্রায় সকলেই হারিয়ে যান।

ইখতিয়ারউদ্দীন মুহাম্মাদ ও এক শতের কিছু বেশি অশ্বারোহী নদী পেরিয়ে আসতে সক্ষম হন।

সেরা সৈন্যদের হারিয়ে ইখতিয়ারউদ্দীন মুহাম্মাদ মনভাংগা হয়ে পড়েন। বেদনা ভরা মন নিয়ে তিনি দেওকোট পৌঁছেন। তিনি জ্বরাক্রান্ত হন। দেওকোট ফিরে আসার তিনমাস পর তিনি ইন্তিকাল করেন।

২. ইয্‌যুদ্দীন মুহাম্মাদ শিরান খালজী

খৃষ্টীয় ১২০৬ সনে লাখনৌতির প্রথম মুসলিম শাসক ইখতিয়ারউদ্দীন মুহাম্মদ বাখতিয়ার খালজীর ইন্তিকাল হলে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের প্রশাসক আলী মারদান খালজী লাখনৌতির কর্তৃত্ব লাভের চেষ্টা করেন। কিন্তু দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের প্রশাসক ইয্‌যুদ্দীন মুহাম্মাদ শিরান খালজী দ্রুত সসৈন্যে এগিয়ে আসেন। তাঁর মুকাবিলা করতে গিয়ে আলী মারদান খালজী পরাজিত ও বন্দী হন। এই অবস্থায় খালজী নেতৃবৃন্দ ইয্‌যুদ্দীন মুহাম্মাদ শিরান খালজীকেই লাখনৌতির শাসক নির্বাচিত করেন।

বন্দীদশা থেকে কৌশলে পালিয়ে আলী মারদান খালজী দিল্লী চলে যান এবং দিল্লীর সুলতান কুত্‌বুদ্দীন আইবেকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। কুত্‌বুদ্দীন অযোধ্যার গভর্ণর কায়-মায রুমীকে লাখনৌতির দিকে সামরিক অভিযান চালাবার নির্দেশ দেন।

আলী মারদান খালজী দিল্লীতেই অবস্থান করতে থাকেন। পশ্চিম অঞ্চলের প্রশাসক হুসামউদ্দীন আইওয়াদ খালজী এতদিন চুপচাপ ছিলেন। কায়-মায রুমীর আক্রমণ কালে তিনি তাঁর সহযোগী হন ও দেওকোটের দিকে অগ্রসর হন। ইয্‌যুদ্দীন মুহাম্মাদ শিরান খালজী দেওকোট ছেড়ে পূর্ব দিকে সরে যান। কায়-মায রুমী দেওকোট পৌছে হুসামউদ্দীন আইওয়াদ খালজীকে লাখনৌতির শাসক নিযুক্ত করেন। মুহাম্মাদ শিরান খালজী বগুড়ার মাহিগঞ্জে নিজের লোকদের হাতে নিহত হন।

৩. হুসামউদ্দীন আইওয়াদ খালজী

খৃষ্টীয় ১২০৮ সনে হুসামউদ্দীন আইওয়াদ খালজী দেওকোটের মসনদে বসেন। এই সময় আলী মারদান খালজী গজনীর তাজউদ্দীন ইয়ালদুজের বিরুদ্ধে কুত্‌বুদ্দীন আইবেককে সাহায্য করে তাঁর আরো বেশি প্রিয় হয়ে উঠেন। সুলতান কুত্‌বুদ্দীন আইবেক আলী মারদান খালজীকে লাখনৌতির গভর্ণর নিযুক্ত করেন। আলী মারদান খালজী সসৈন্যে লাখনৌতির দিকে অগ্রসর হন। হুসামউদ্দীন আইওয়াদ খালজী যুদ্ধের পথে না গিয়ে ১২১০ সনে দিল্লীর সুলতানের নমিনির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন।

৪. আলী মারদান খালজী

খৃষ্টীয় ১২১০ সনে আলী মারদান খালজী লাখনৌতির শাসক হন। ঐ বছর নভেম্বর মাসে দিল্লীর সুলতান কুত্‌বুদ্দীন আইবেক ইন্তিকাল করেন।

লাহোর ভিত্তিক আমীরগণ কুত্‌বুদ্দীন আইবেকের পুত্র আরামশাহকে ও দিল্লী ভিত্তিক আমীরগণ কুত্‌বুদ্দীনের জামাতা ইলতুতমিসকে সুলতান হিসেবে গ্রহণ করেন। এই গোলযোগের সময় সিনধের গভর্ণর নাসিরউদ্দীন কাবাচা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

আলী মারদান খালজী সুলতান আলাউদ্দীন আলী মারদান খালজী উপাধি ধারণ করে লাখনৌতিতে স্বাধীনভাবে শাসনকার্য চালাতে শুরু করেন। তিনি বিহারেও তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন।

খৃষ্টীয় ১২১২ সনে সুলতান ইলতুতমিস অন্য সব প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করে দিল্লীতে তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন।

এই সময় হুসামউদ্দীন আইওয়াদ খালজী দিল্লীর সুলতান ইলতুতমিসের অনুমোদন লাভ করে আলী মারদান খালজী বিরোধী আমীরদেরকে সংগঠিত করেন। তাঁরা আলী মারদান খালজীকে হত্যা করে হুসামউদ্দীন আইওয়াদ খালজীকে লাখনৌতির শাসনকর্তা নির্বাচিত করেন।

৩—

৫. গিয়াসউদ্দীন আইওয়াদ খালজী

খৃষ্টীয় ১২১৩ সনে হুসামউদ্দীন আইওয়াদ খালজী গিয়াসুউদ্দীন আইওয়াদ খালজী উপাধি ধারণ করে দেওকোটের মসনদে বসেন।

প্রথম ছয় বছর তিনি দিল্লীর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন। পরবর্তী বছরগুলোতে তিনি নিজের নামে মুদ্রা জারি করেন। এই মুদ্রাগুলোর এক পিঠে কালেমা ও অপর পিঠে 'আস্‌সুলতানুল আযম,' 'সুলতানুল মুয়াযযাম', 'নাসের আমীরুল মুমিনীন' ও 'সুলতানুস্ সালাতীন' উপাধিসহ তাঁর নাম অংকিত থাকতো।

তাঁর শাসনকালে লাখনৌতি রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটে। জাযনগর (উড়িশা), বংগ, কামরূপ (আসাম) ও তিরহুতের (উত্তর বিহার) রাজাগণ তাঁর জন্য মূল্যবান উপহার সামগ্রী পাঠাতেন। তিনি অনেকগুলো রণ-তরীও তৈরি করেছিলেন।

তিনি দেওকোট থেকে গৌড়ে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। গৌড়ে অনেকগুলো সুন্দর অট্টালিকা নির্মিত হয়। উত্তর-পূর্ব দিকে সত্তর মাইল দূরে অবস্থিত দেওকোট ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে পঁচাশি মাইল দূরে অবস্থিত লাখনূর শহরের সাথে উচ্চ সড়ক দ্বারা রাজধানী সংযুক্ত ছিলো।

গিয়াসুদ্দীন আইওয়াদ খালজী দেশের বিভিন্ন স্থানে বহু মাসজিদ নির্মাণ করেন। বিশিষ্ট আলিমদের জন্য তিনি ভাতা বরাদ্দ করেন। কখনো কখনো বিশিষ্ট আলিমদেরকে এনে তিনি প্রাসাদ কক্ষে ওয়াযের ব্যবস্থা করতেন।

গিয়াসউদ্দীন আইওয়াদ খালজী স্বাধীনভাবে লাখনৌতি শাসন করছিলেন। খৃষ্টীয় ১২২৫ সনে দিল্লীর সুলতান ইলতুতমিস লাখনৌতির ওপর দিল্লীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। গিয়াসউদ্দীন আইওয়াদ খালজী যুদ্ধে না নেমে তাঁর সাথে সন্ধি করেন।

সুলতান ইলতুতমিস বিহারকে আলাদা করে আলাউদ্দীন মাসউদ জানিকে সেখানকার গভর্ণর নিযুক্ত করেন। সুলতান ইলতুতমিস দিল্লী ফিরে গেলে গিয়াসউদ্দীন আইওয়াদ খালজী বিহার থেকে মাসউদ জানিকে তাড়িয়ে দেন। খবর পেয়ে সুলতান ইলতুতমিস প্রিন্স নাসিরুদ্দীনের সেনাপতিত্বে লাখনৌতির দিকে সৈন্য প্রেরণ করেন। এই সময় গিয়াসউদ্দীন আইওয়াদ খালজী বংগ রাজ্যের দিকে এক সামরিক অভিযান পরিচালনা করছিলেন। দিল্লীর সৈন্যদের আগমনের খবর পেয়ে তিনি দ্রুত ফিরে চলেন। গৌড়ের নিকট উভয় বাহিনীর মুকাবিলা হয়। যুদ্ধে তিনি পরাজিত হয়ে ধৃত ও নিহত হন।

৬. প্রিন্স নাসিরুদ্দীন

খৃষ্টীয় ১২২৭ সনে গৌড়ের নিকটে গিয়াসউদ্দীন আইওয়াদ খালজীকে পরাজিত করে প্রিন্স নাসিরুদ্দীন লাখনৌতির শাসক হন। তিনি অযোধ্যার সাথে বিহার ও

লাখনৌতিকে যুক্ত করে নেন। গৌড় বা লক্ষণাবতীই ছিলো এই যুক্ত রাজ্যের রাজধানী। নাসিরুদ্দীন দেড় বছর শাসন কার্য পরিচালনা করেন। এই সময় তিনি ইসলামী ভাবধারা বিকাশের জন্য প্রচেষ্টা চালান। তিনি আলিমদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তাঁর পিতা সুলতান ইলতুতমিস বাগদাদের খালীফার নিকট থেকে স্বীকৃতি ও কিছুসংখ্যক মূল্যবান পোষাক পান। দিল্লীর শাসকদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম বাগদাদের খালীফার নিযুক্তি পত্র পান। তিনি একটি পোষাক নাসিরুদ্দীনের জন্য পাঠান এবং তাঁকে 'মালিকুশ্‌শারক' বা পূর্বাঞ্চলের রাজা উপাধি দেন। খৃষ্টীয় ১২২৯ সনে নাসিরুদ্দীন অসুস্থ হয়ে পড়েন ও ইন্তিকাল করেন।

৭. মালিক ইখতিয়ারউদ্দীন বলকা খালজী

খৃষ্টীয় ১২২৯ সনে প্রিন্স নাসিরুদ্দীন ইন্তিকাল করলে গিয়াসউদ্দীন আইওয়াদ খালজীর অন্যতম ভক্ত মালিক ইখতিয়ারউদ্দীন বলকা খালজী লাখনৌতির শাসনভার হাতে তুলে নেন। তিনি নিজের নামে ও দিল্লীর সুলতানের নামে মুদ্রা জারি করেন। কিন্তু তিনি ইলতুতমিসের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারেন নি। ইলতুতমিস সসৈন্যে লাখনৌতি আসেন। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে বলকা খালজী নিহত হন।

৮. মালিক আলাউদ্দীন মাস'উদ জানী

খৃষ্টীয় ১২৩১ সনে দিল্লীর সুলতান ইলতুতমিস মালিক আলাউদ্দীন মাস'উদ জানীকে লাখনৌতির গভর্ণর নিযুক্ত করেন। কিন্তু এক বছর পরই তাঁকে বদলি করা হয়।

৯. মালিক সাইফুদ্দীন আইবেক

খৃষ্টীয় ১২৩২ সনে মালিক সাইফুদ্দীন আইবেক লাখনৌতির গভর্ণর নিযুক্ত হন। মালিক সাইফুদ্দীন আইবেক বংগ রাজ্যের দিকে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেছিলেন।

খৃষ্টীয় ১২৩৬ সনে দিল্লীর সুলতান ইলতুতমিস ইন্তিকাল করেন। একই সনে মালিক সাইফুদ্দীন আইবেকও লাখনৌতিতে ইন্তিকাল করেন। তাঁর অন্যতম সাথী আওর খান ক্ষমতা দখল করেন। কিন্তু বিহারের গভর্ণর তুগ্রল তুগান খান তাঁকে পরাজিত ও নিহত করে যুগপৎ বিহার ও লাখনৌতির শাসক হন।

১০. তুগ্রল তুগান খান

খৃষ্টীয় ১২৩৬ সনে তুগ্রল তুগান খান লাখনৌতির মসনদে বসেন। ঐ সময় দিল্লীর শাসক ছিলেন সুলতানা রাজিয়া। তুগ্রল তুগান খান তাঁর অনুমোদন হাছিল করেন।

তুগ্রল তুগান খান একজন সুযোগ্য শাসক ছিলেন। তিনি লাখনৌতির সামরিক শক্তি বৃদ্ধির প্রতি মনোযোগ দেন। তিনি বিরাট পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী গড়ে তোলেন। তাঁর শাসনকালে নৌ-বাহিনী আরো বেশি শক্তিশালী করা হয়।

খৃষ্টীয় ১২৪০ সনে সুলতানা রাজিয়া ইন্তিকাল করেন। আলাউদ্দীন মাস'উদ জানী হন দিল্লীর সুলতান। তিনি তুগ্রল তুগান খানকে বিহার ও লাখনৌতির শাসক হিসেবে স্বীকৃতি দান করেন।

তাঁর শাসন কালে ইসলামের অন্যতম মুবাল্লিগ মাখদুম শাহ দৌলা পাবনার শাহজাদপুরে এসে ইসলাম প্রচার করেন। তিনি ছিলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সা) অন্যতম সাহাবী মুয়ায ইবনু জাবালের (রা) বংশধর। স্থানীয় হিন্দুরাজা আক্রমণ চালিয়ে তাঁকে ও তাঁর একুশজন সাথীকে হত্যা করেন। শেষ পর্যন্ত অবশিষ্ট মুসলিমগণ বিজয়ী হন। তাঁরা ঐ অঞ্চলে জোরেশোরে ইসলাম প্রচারের কাজ চালাতে থাকেন।

১১. মালিক তামার খান

খৃষ্টীয় ১২৪৫ সনে অযোধ্যার গভর্ণর মালিক তামার খান লাখনৌতির শাসক তুগ্রল তুগান খানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। তুগ্রল পরাজিত হয়ে পালিয়ে যান। মালিক তামার খান লাখনৌতির শাসক হন। তিনি দিল্লীর অনুমোদন ছাড়াই এই সামরিক অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু দিল্লীর দুর্বল সুলতান আলাউদ্দীন মাস'উদ শাহ মালিক তামার খানের এই ধৃষ্টতার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি।

খৃষ্টীয় ১২৪৬ সনে মালিক তামার খান ইন্তিকাল করেন।

১২. মালিক জালালুদ্দীন মাস'উদ জানী

খৃষ্টীয় ১২৪৭ সনে মালিক জালালুদ্দীন মাস'উদ জানী লাখনৌতির গভর্ণর নিযুক্ত হন। তিনি মালিকুশ শার্ক' বা পূর্বাঞ্চলের রাজা উপাধি ধারণ করেন।

খৃষ্টীয় ১২৫১ সনে তিনি অযোধ্যায় বদলি হয়ে যান।

১৩. মালিক ইখতিয়াউদ্দীন ইউজবাক

খৃষ্টীয় ১২৫১ সনের শুরুতে দিল্লীর সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ মালিক ইখতিয়াউদ্দীন ইউজবাককে লাখনৌতির গভর্ণর নিযুক্ত করেন।

খৃষ্টীয় ১২৫৫ সনের দিকে দিল্লীতে রাজনৈতিক গোলযোগ দেখা দেয়। এই সময় মালিক ইখতিয়ারউদ্দীন ইউজবাক 'আসসুলতানুল আযম মুগীসুদ দুনিয়া ওয়াদ দীন আবুল মুযাফ্ফার ইউজবাক আস্‌সুলতান, উপাধি ধারণ করে নিজের নামে মুদ্রা জারি শুরু করেন। ঐ বছর তিনি অযোধ্যা দখল করেন। ফলে তিনি অযোধ্যা-বিহার-লাখনৌতির শাসক হন।

খৃষ্টীয় ১২৫৭ সনে তিনি কামরূপের (আসাম) দিকে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। এই সময় কামরূপ জিলা ও আরো কিছু অংশের ওপর কোচ হাজো নামক

একব্যক্তি কর্তৃত্বশীল ছিলেন। মুসলিম বাহিনী এগিয়ে এলে কোচ হাজো পূর্ব দিকে সরে যান। মালিক ইখতিয়াউদ্দীন ইউজবাক কোচ হাজোর রাজধানী দখল করে সেখানে অবস্থান করতে থাকেন। এটি ছিলো একটি ভুল সিদ্ধান্ত। কিছু কাল পর ঐ অঞ্চলে প্রবল বৃষ্টিপাত শুরু হয়। চারদিক পানিতে ডুবে যায়। এই সুযোগে কোচ হাজো তাঁর বাহিনী নিয়ে এগিয়ে এসে মুসলিম বাহিনীর ওপর অতর্কিত হামলা চালান। মুসলিম বাহিনী বিধ্বস্ত হয়। যুদ্ধে মালিক ইখতিয়ারউদ্দীন ইউজবাক মারাত্মকভাবে আহত হন। অল্পকাল পরে তিনি ইন্তিকাল করেন।

১৪. মালিক ইয্যুদ্দীন বলবন ইউজবাকী

খৃষ্টীয় ১২৫৭ সনে মালিক ইখতিয়ারউদ্দীন ইউজবাকের অন্যতম আত্মীয় মালিক ইযযুদ্দীন বলবন ইউজবাকী লাখনৌতির মসনদে বসেন। তিনি দিল্লীর সুলতানের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন।

খৃষ্টীয় ১২৫৯ সনে মালিক ইয্যুদ্দীন বলবন ইউজবাকী বংগ রাজ্যের দিকে একটি সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। বংগ রাজ্য জয়ের জন্য এটি ছিলো লাখনৌতি রাজ্যের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা। কিন্তু এবারও অভিযান সফল হয়নি। লাখনৌতির সৈন্যরা যখন বংগ অভিযানে ব্যস্ত তখন আল্লাহাবাদের গভর্ণর মালিক তাজউদ্দীন আরসালান লক্ষণাবতী আক্রমণ ও দখল করেন। ফলে বংগ অভিযান মুলতবী রেখে মালিক ইযযুদ্দীন বলবন ইউজবাকী লক্ষণাবতীর দিকে ফিরে আসেন। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে তিনি নিহত হন।

১৫. মালিক তাজউদ্দীন আরসালান

খৃষ্টীয় ১২৫৯ সন থেকে ১২৬৫ সন পর্যন্ত মালিক তাজউদ্দীন আরসালান লাখনৌতি শাসন করেন।

১৬. তাতার খান

খৃষ্টীয় ১২৬৫ সনে মালিক তাজউদ্দীন আরসালানের পুত্র তাতার খান লাখনৌতির মসনদে বসেন।

খৃষ্টীয় ১২৬৬ সনে দিল্লীর সুলতান হন বলবন। তাতার খান তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। খৃষ্টীয় ১২৬৮ সনে তাতার খান ইন্তিকাল করেন।

১৭. শের খান

খৃষ্টীয় ১২৬৮ সনে মালিক তাজউদ্দীন আরসালানের অন্যতম আত্মীয় শেরখান লক্ষণাবতীর মসনদে বসেন। তিনি চার বছর লাখনৌতি শাসন করেন।

১৮. আমিন খান, মুগীসুদ্দীন তুগ্রল

খৃষ্টীয় ১২৭২ সনে শের খান ইন্তিকাল করেন। দিল্লীর সুলতান বলবন অযোধ্যার

গভর্ণর আমিন খানকে অযোধ্যার সাথে লাখনৌতিরও গভর্ণর নিযুক্ত করেন। ডেপুটি গভর্ণর নিযুক্ত হন মুগীসুদ্দীন তুগ্রল। প্রকৃত পক্ষে মুগীসুদ্দীন তুগ্রলই ছিলেন লাখনৌতির শাসক।

মুগীসুদ্দীন তুগ্রলের অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব হচ্ছে বংগ রাজ্য জয়। তিনি সেন বংশের শেষ রাজাকে পরাজিত করে বংগরাজ্য লাখনৌতি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। সোনারগাঁও অঞ্চলও তাঁর শাসনাধীন হয়। তিনি ঢাকার পঁচিশ মাইল দক্ষিণে লারিকল নামক স্থানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। এই দুর্গের নাম 'কিলা-ই তুগ্রল। বরিশাল জিলার দনুজ মাধব ছাড়া এই অঞ্চলে আর কোন হিন্দু রাজা ছিলেন না।

মুগীসুদ্দীন তুগ্রলের আরেকটি বড়ো কৃতিত্ব হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যে সামরিক অভিযান পরিচালনা। ত্রিপুরা রাজ্যের যুবরাজ রত্ন -ফা তাঁর ভাই রাজা-ফা-এর বিরুদ্ধে মুগীসুদ্দীন তুগ্রলের সাহায্য চান। মুগীসুদ্দীন তুগ্রল সসৈন্যে ত্রিপুরা পৌঁছেন। উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে রাজা-ফা নিহত হন। মুগীসুদ্দীন তুগ্রল রত্ন-ফাকে ত্রিপুরার মসনদে বসান। রত্ন-ফা মুগীসুদ্দীনকে একটি ভেক-মনি ও একশত হাতী উপহার দেন। মুগীসুদ্দীন তুগ্রল রত্ন-ফা কে 'মানিক্য' উপাধি দেন। তখন থেকে ত্রিপুরার রাজাগণ 'মানিক্য' উপাধি ধারণ করতেন।

ইতিমধ্যে দিল্লীর সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবন মুগল আক্রমণ প্রতিহত করা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। অবস্থা এতোখানি নাজুক হয়ে পড়ে যে তিনি দিল্লী থেকে রাজধানী লাহোরে সরিয়ে নিতে বাধ্য হন। এই সময় গিয়াসুদ্দীন বলবন মারা গেছেন বলে গুজব ছড়িয়ে পড়ে।

খৃষ্টীয় ১২৭৭ সনে মুগীসুদ্দীন তুগ্রল লাখনৌতির স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, সুলতান উপাধি ধারণ করেন এবং নিজের নামে মুদ্রা জারি করেন।

খৃষ্টীয় ১২৭৮ সনে গিয়াসুদ্দীন বলবন অযোধ্যার গভর্ণর মালিক তুরমাতি-র নেতৃত্বে মুগীসুদ্দীন তুগ্রলের বিরুদ্ধে একটি সেনাদল পাঠান। তিরহুতের নিকট যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে মালিক তুরমাতি পরাজিত হন।

খৃষ্টীয় ১২৭৯ সনে গিয়াসুদ্দীন বলবন আরেকটি বাহিনী প্রেরণ করেন লাখনৌতির দিকে। এই বাহিনীও পরাজিত হয়।

খৃষ্টীয় ১২৮০ সনে গিয়াসুদ্দীন বলবন নিজেই বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে লাখনৌতি পৌঁছেন। মুগীসুদ্দীন তুগ্রল দিল্লীর সুলতানের মুকাবিলা না করে লারিকল দুর্গে সরে আসেন। তুগ্রল যাতে আরো দক্ষিণে সরে যেতে না পারেন সেই পথ বন্ধ করার জন্য গিয়াসুদ্দীন বলবন বরিশালের রাজা দনুজ মাধবের সাথে চুক্তি করেন। তুগ্রল লারিকল দুর্গ থেকে বেরিয়ে জাযনগরের (উড়িশা) দিকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা

করেন। পথিমধ্যে তিনি বলবনের অন্যতম সেনাপতি মালিক শের আন্দাজের হাতে নিহত হন।

১৯. সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ বুগরা খান

খৃষ্টীয় ১২৮২ সনে গিয়াসুদ্দীন বলবন তাঁর পুত্র নাসিরুদ্দীন বুগরা খানকে লাখনৌতির গভর্ণর নিযুক্ত করে যান। দিল্লীতে ফিরে যাবার আগে তিনি শাহজাদা নাসিরুদ্দীন বুগরা খানকে 'দিয়ার-ই-বাঙালাহ' দখল করার নির্দেশ দিয়ে যান। 'দিয়ার-ই-বাঙালাহ' বলতে তিনি সম্ভবত বংগ রাজ্যের অবশিষ্ট দুইটি অংশ মোমেনশাহী ও বরিশালকে বুঝিয়েছেন।

খৃষ্টীয় ১২৯০ সনে দিল্লীতে বলবন বংশের শাসন খতম হয় ও খালজী বংশের শাসন শুরু হয়। দিল্লীতে আপন বংশের শাসন খতম হয়ে যাওয়ায় শাহজাদা বুগরা খান সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ বুগরা খান উপাধি ধারণ করে স্বাধীন ভাবে লাখনৌতি শাসন করতে থাকেন। তিনি তাঁর শাসিত দেশটিকে চারটি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত করেন। এইগুলো ছিলো ঃ বিহার অঞ্চল, লক্ষণাবতী-দেওকোট অঞ্চল, সাতগাঁও-হুগলী অঞ্চল ও সোনারগাঁও অঞ্চল।

খৃষ্টীয় ১২৯০ সনে সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ বুগরা খান ইন্তিকাল করেন।

২০. সুলতান রুকনুদ্দীন কাইকাউস

খৃষ্টীয় ১২৯০ সনে নাসিরুদ্দীন মাহমুদ বুগরা খানের পুত্র রুকনুদ্দীন কাইকাউস লাখনৌতির সুলতান হন। তিনিও নিজের নামে মুদ্রা জারি করেন।

তাঁর একটি রৌপ্য মুদ্রায় "এই রৌপ্য মুদ্রা বংগ থেকে প্রাপ্ত খারাজ দ্বারা লক্ষণাবতী টাকশাল থেকে মুদ্রিত" বাক্যটি উৎকীর্ণ ছিলো। এ থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে বংগ রাজ্য তাঁর কর্তৃত্বাধীন ছিলো। মুসলিমদের দ্বারা বংগ শব্দটির এইটিই প্রথম ব্যবহার।

তাঁর শাসনকালের একটি মুদ্রায় দেওকোটে একটি মাসজিদ ও আরেকটি মুদ্রায় বিহারের মুংগের জিলার লাখিসরাই জামে মাসজিদ নির্মাণের উল্লেখ রয়েছে। তাঁর শাসনকালে হুগলীর শাসনকর্তা ত্রিবেনীতে 'দারুল খাইরাত' নামে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন।

উল্লেখ্য যে সম্ভবত খৃষ্টীয় ১২৭৮ সনে ইসলামের অন্যতম সেরা মুবাল্লিগ শায়খ শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ সোনারগাঁও এসে বসতি স্থাপন করেন। তিনি ইসলামের নির্ভেজাল জ্ঞান বিতরণের জন্য এখানে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন।

তাঁর ছাত্র ও জামাতা শায়খ শারফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরীও এই মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। অবশ্য ১২৯৩ সনে তিনি তাঁর জন্মভূমি বিহারের অন্তর্ভুক্ত মানের নামক

স্থানে ফিরে যান। শায়খ শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ খৃষ্টীয় ১৩০০ সনে সোনারগাঁওয়ে ইন্তিকাল করেন।

২১. সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজশাহ

খৃষ্টীয় ১৩০১ সনে সুলতান রুকনুদ্দীন কাইকাউসের ইন্তিকাল হলে শামসুদ্দীন ফিরোজশাহ লাখনৌতির সুলতান হন।

তাঁর শাসন কালের অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব হচ্ছে সিলেট বিজয়। এই সময় গৌরগোবিন্দ নামক একজন হিন্দু রাজা সিলেট শাসন করতেন। তিনি ছিলেন মুসলিম নির্যাতক।

সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজশাহ সেনাপতি সিকান্দার গাজীর নেতৃত্বে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন গৌরগোবিন্দের বিরুদ্ধে। দুইবার হামলা চালিয়েও সিকান্দার গাজী তাঁকে পরাজিত করতে পারেননি। পরে অন্যতম সেনাপতি সাইয়েদ নাসিরুদ্দীন তাঁর হাত শক্তিশালী করেন। তদুপরি ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুবাল্লিগ শাহ জালাল তাঁর তিনশত জন সাথী নিয়ে মুসলিম বাহিনীতে যোগদান করেন। আবারো সামরিক অভিযান পরিচালিত হয় গৌর গোবিন্দের বিরুদ্ধে। পরাজিত হয়ে গৌর গোবিন্দ গহীন জংগলের দিকে পালিয়ে যান। খৃষ্টীয় ১৩০৩ সনে সিলেট লাখনৌতি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। উল্লেখ্য যে এই সময় দিল্লীর সুলতান ছিলেন আলাউদ্দীন খালজি। সিলেট বিজয়ের পর শাহ জালাল তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে সিলেট অঞ্চলে থেকে যান। তাঁরা মানুষের সামনে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য উপস্থাপনের কাজ করতে থাকেন। তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে ঐ অঞ্চলের বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করে।

উল্লেখ্য যে এই সময় ইসলামের অন্যতম বিশিষ্ট মুবাল্লিগ সাইয়েদ আহমাদ তান্নুরী লক্ষীপুর জিলার কাঞ্চনপুরে কেন্দ্র স্থাপন করে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন। তিনি ছিলেন আবদুল কাদির জিলানীর (রহ) পৌত্র। আবার, শাহ বাখতিয়ার মাইসুর নামক আরেকজন মুবাল্লিগ সন্দীপে অবস্থান করে দ্বীপাঞ্চলে ইসলামের মর্মবাণী মানুষের নিকট পৌঁছাতে থাকেন।

খৃষ্টীয় ১৩১৩ সনে সেনাপতি জাফর খান সাতগাঁও জয় করেন। ইসলামের অন্যতম মুবাল্লিগ শাহ শফীউদ্দীন এই অভিযানে তাঁকে সহযোগিতা করেন।

শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের রাজ্য সীমা পশ্চিমে বিহারের শোন নদী থেকে শুরু করে পূর্বে সিলেট পর্যন্ত এবং উত্তরে দিনাজপুর থেকে দক্ষিণে সুন্দরবন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো।

খৃষ্টীয় ১৩২২ সনে সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ ইন্তিকাল করেন।

২২. নাসিরুদ্দীন ইব্রাহীম

খৃষ্টীয় ১৩২২ সনে সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজশাহের ইন্তিকাল হলে তাঁর পুত্র শিহাবুদ্দীন মসনদে বসেন। কিন্তু তাঁর ভাই গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ বিদ্রোহী হয়ে যুদ্ধে নামেন। শিহাবুদ্দীন পরাজিত হন। অপর ভাই নাসিরুদ্দীন ইবরাহীম লাখনৌতির কর্তৃত্ব হাতে নেন। আর গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ সোনারগাঁওতে সরে গিয়ে নিজের কর্তৃত্ব স্থাপন করেন।

এই গোলযোগের সময় খৃষ্টীয় ১৩২৪ সনে দিল্লীর সুলতান গিয়াসুদ্দীন তুগলক লাখনৌতির উদ্দেশ্যে বের হয়ে তিরহুত দখল করেন। নাসিরুদ্দীন ইবরাহীম সেখানে গিয়ে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। গিয়াসুদ্দীন তুগলক সেনাপতি বাহরাম খান ওরফে তাতার খানকে গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। বাহাদুর শাহ পরাজিত ও বন্দী হন। গিয়াসুদ্দীন তুগলক নাসির উদ্দীন ইবরাহীমকে লাখনৌতির গভর্ণর হিসেবে স্বীকৃতি দেন। তবে তিনি সোনারগাঁও ও সাতগাঁও অঞ্চল বাহরাম খান ওরফে তাতার খানের হাতে ন্যস্ত করে যান।

২৩. বাহরাম খান, বাহাদুর শাহ

খৃষ্টীয় ১৩২৫ সনে দিল্লীর সুলতান গিয়াসুদ্দীন তুগলক ইন্তিকাল করেন। তাঁর পুত্র মুহাম্মাদ তুগলক দিল্লীর সুলতান হন।

মুহাম্মাদ তুগলক লাখনৌতিতে বন্দী বাহাদুর শাহকে মুক্ত করে তাঁকে ও বাহরাম খানকে যৌথ ভাবে লাখনৌতির গভর্ণর নিযুক্ত করেন।

বাহরাম খানের সিলাহদার ফাখরুদ্দীন ভুলুয়া (নোয়াখালী), চট্টগ্রাম অঞ্চলে মুসলিম শাসন সম্প্রসারিত করেন। তিনি ভুলুয়াতেই তাঁর প্রশাসনিক কেন্দ্র স্থাপন করেন।

খৃষ্টীয় ১৩২৮ সনে বাহাদুর শাহ দিল্লীর কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন। ফলে বাহরাম খান তাঁর বিরুদ্ধে হামলা চালান। যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হন।

অতপর মুহাম্মাদ তুগলক লাখনৌতি রাজ্যকে তিন ভাগে বিভক্ত করে প্রতি ভাগে একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্তা হন কাদার খান, সাতগাঁওয়ের শাসনকর্তা হন ইযযুদ্দীন ইয়াহইয়া। আর বাহরাম খান নিযুক্ত হন সোনারগাঁওয়ের শাসনকর্তা।

২৪. ফাখরুদ্দীন মুবারক শাহ, কাদার খান

খৃষ্টীয় ১৩৩৬ সনে সোগারগাঁওয়ের শাসনকর্তা বাহরাম খানের ইন্তিকাল হলে তাঁর সেনাপতি ফাখরুদ্দীন 'আবুল মুযযাফফার ফাখরুদ্দীন মুবারক শাহ' উপাধি ধারণ করে সোনারগাঁওয়ের মসনদে বসেন এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সোনারগাঁও থেকে তাঁর জারিকৃত মুদ্রাতে 'ইয়ামীনুল খালীফাহ' ও 'নাসির আমীরুল মুমিনীন' শব্দগুলো উৎকর্ণ ছিলো।

ফাখরুদ্দীন মুবারকশাহ্ কর্তৃক সোনারগাঁওয়ের স্বাধীনতা ঘোষিত হলে দিল্লীর সুলতান মুহাম্মাদ তুগলক লক্ষণাবতীর শাসনকর্তা কাদার খান ও সাতগাঁওয়ের শাসনকর্তা ইযযুদ্দীন ইয়াহইয়াকে সোনারগাঁও আক্রমণের নির্দেশ দেন। তাঁরা সসৈন্যে এগিয়ে এলে ফাখরুদ্দীন মুবারক শাহ্ যুদ্ধ না করে পূর্ব দিকে সরে যান। কাদার খান সোনারগাঁও দখল করেন। তবে মালে গানীমাহ্ বিতরণে অবিচার করায় সৈন্যগণ তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়। এই দিকে শুকনো মওসুম শেষ হয়ে যায় ও বর্ষা কাল শুরু হয়। কাদার খানের সৈন্য ও ঘোড়া দল অসুস্থ হয়ে পড়তে থাকে। এই সুযোগে ফাখরুদ্দীন মুবারক শাহ্ নৌপথে ফিরে এসে কাদার খানকে অবরুদ্ধ করে ফেলেন। কাদার খানের প্রতি সৈন্যরা বিদ্রোহী হয়ে তাঁকে হত্যা করে। ফাখরুদ্দীন মুবারক শাহ্ আবার সোনারগাঁওতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

খৃষ্টীয় ১৩৪৯ সন পর্যন্ত তিনি স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করেন।

২৫. আলাউদ্দীন আলী শাহ্, ইখতিয়ারউদ্দীন গাজী শাহ্

আলী মুবারক ছিলেন লাখনৌতির শাসক কাদার খানের অন্যতম সেনাপতি। কাদার খান সোনারগাঁওয়ে নিহত হয়েছেন খবর পেয়ে আলী মুবারক আলাউদ্দীন আলী শাহ উপাধি ধারণ করে লাখনৌতির মসনদে বসেন। আলাউদ্দিন আলী শাহ্ লক্ষণাবতী থেকে পাণ্ডুয়াতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

খৃষ্টীয় ১৩৪৯ সনে সোনারগাঁওয়ের শাসক ফাখরুদ্দীন মুবারক শাহের ইন্তিকাল হলে তাঁর পুত্র ইখতিয়ারউদ্দীন গাজী শাহ্ মসনদে বসেন।

উল্লেখ্য যে লাখনৌতি ও সোনারগাঁওয়ের মধ্যে বারবার যুদ্ধ হতে থাকে।

খৃষ্টীয় ১৩৪২ সনে হাজী ইলিয়াস লাখনৌতির শাসক আলাউদ্দীন আলী শাহকে এবং খৃষ্টীয় ১৩৫২ সনে সোনারগাঁওয়ের শাসক ইখতিয়ার উদ্দীন গাজী শাহকে পরাজিত করে উভয় রাজ্য একত্রিত করে স্বাধীন সুলতান হিসেবে পাণ্ডুয়া থেকে দেশ শাসন করতে থাকেন।

২৬. শাহ্-ই-বাঙালাহ্

শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্

সাতগাঁওয়ের শাসনকর্তা ইয্যুদ্দীন ইয়াহইয়ার ইন্তিকাল হলে হাজী ইলিয়াস সাতগাঁওয়ের মসনদে বসেন।

খৃষ্টীয় ১৩৪২ সনে হাজী ইলিয়াস লাখনৌতির শাসনকর্তা আলাউদ্দীন আলী শাহ্কে পরাজিত করেন ও সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্ উপাধি ধারণ করে পাণ্ডুয়ার মসনদে বসেন। কিছুকাল পর তিনি তিরহুত দখল করেন।

খৃষ্টীয় ১৩৪৬ সনে তিনি নেপাল অভিমুখে সামরিক অভিযান চালিয়ে রাজধানী

কাঠমণ্ডু পর্যন্ত পৌঁছেন। অবশ্য তিনি সেখানে বেশি দিন থাকেন নি। তবে দক্ষিণ বিহারে তিনি তাঁর অবস্থান সুদৃঢ় করেন। তিনি উড়িশাও জয় করেন।

খৃষ্টীয় ১৩৫২ সনে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্ সোনারগাঁওয়ের সুলতান ইখতিয়ার উদ্দীন গাজী শাহকে পরাজিত করে সোনারগাঁও দখল করেন।

শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্ স্বাধীন বাঙালাহ্ সালতানাতের স্থপতি। বাঙালাহ্র সকল অঞ্চল তাঁর সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং বাঙালাহ্ নামে অভিহিত হয়।

দিল্লীর সুলতান ফিরোজশাহ্ তুগলক বাঙালাহ্ আক্রমণ করেন। সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্ কৌশলগত কারণে পাণ্ডুয়া থেকে একডালা দুর্গে সরে আসেন, কিন্তু বশ্যতা স্বীকার করেননি। পরে একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করে ফিরোজশাহ্ তুগলক দিল্লী ফিরে যান।

ইতিহাসবিদ শামস-ই-সিরাজ আফীফ তাঁর গ্রন্থে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহকে "শাহ-ই-বাঙালাহ" ও "সুলতান-ই-বাঙালাহ" নামে অভিহিত করেছেন। শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্ পাণ্ডুয়াতে অবস্থান করে বাঙালাহ্ সালতানাত শাসন করেন।

শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্ একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম ছিলেন। তিনি আলিমদের কদর করতেন। তাঁর শাসন কালে শায়খ আখি সিরাজুদ্দীন উসমান পাণ্ডুয়াতে অবস্থান করে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন। শায়খ রিযা বিয়াবানী ছিলেন আরেকজন মুবাল্লিগ। তাঁদের প্রচেষ্টায় রাজধানীর নিকটবর্তী অঞ্চলে ইসলাম ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্ দীর্ঘ পনর বছর বাঙালাহ্ সালতানাত পরিচালনা করেন।

খৃষ্টীয় ১৩৫৭ সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।

২৭. আবুল মুজাহিদ সিকান্দার শাহ

খৃষ্টীয় ১৩৫৮ সনে সুলতান শামসুদ্দনি ইলিয়াস শাহের পুত্র আবুল মুজাহিদ সিকান্দার শাহ্ বাঙালাহ্ সালতানাতের সুলতান হিসেবে পাণ্ডুয়ার মসনদে বসেন। তাঁর শাসনকালে দিল্লীর সুলতান ফিরোজশাহ্ তুগলক দ্বিতীয়বার বাঙালাহ্ আক্রমণ করেন। আবুল মুজাহিদ সিকান্দার শাহ্ পিতার অনুরূপ রণকৌশল অবলম্বন করেন। শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষে সন্ধি হয়। খৃষ্টীয় ১৩৫৯ সনে ফিরোজ শাহ্ তুগলক দিল্লী ফিরে যান।

আবুল মুজাহিদ সিকান্দর শাহ সালতানাতের বিভিন্ন স্থানে বহু মাসজিদ নির্মাণ করেন। রাজধানী পাণ্ডুয়াতে নির্মিত আদিনা মাসজিদ তাঁর অমর কীর্তি। এই বিশাল মাসজিদ নির্মাণ করতে চার বছর সময় লেগেছিলো।

তাঁর শাসন কালে ইসলামের অন্যতম সেরা মুবাল্লিগ শায়খ আলাউল হক পাণ্ডুয়াতে অবস্থান করে দীনের মর্মবাণী মানুষের নিকট পৌঁছাতে থাকেন। এক সময় এই

সম্মানিত মুবাল্লিগের সংগে তাঁর সম্পর্কের অবনতি ঘটে। তিনি সোনারগাঁও চলে যান। অবশ্য পরে তিনি আবার পাণ্ডুয়াতে ফিরে আসেন।

আল মুজাহিদ সিকান্দার শাহের কোন কোন মুদ্রায় 'আল মুজাহিদ ফী সাবীলির রাহমান' ও 'ইমামুল আযম' শব্দগুলো উৎকীর্ণ দেখা যায়। এইগুলোতে ইসলামের অনুশীলন ও ইসলামের পৃষ্ঠপোষকতার ব্যাপারে তাঁর মনোভংগির পরিচয় মেলে।

২৮. গিয়াসুদ্দীন আযম শাহ

খৃষ্টীয় ১৩৯০ সনে গিয়াসুদ্দীন আযম শাহ তাঁর পিতা আবুল মুজাহিদ সিকান্দার শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়। সিকান্দার শাহ আহত হন ও পরে ইন্তিকাল করেন।

গিয়াসুদ্দীন আযম শাহ বাঙালাহর সুলতান হিসেবে পাণ্ডুয়ার মসনদে বসেন।

গিয়াসুদ্দীন আযম শাহ একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম ছিলেন। তিনি একনিষ্ঠভাবে শারীয়াহ অনুসরণ করতেন। তিনি ছিলেন ইসলামী জ্ঞান চর্চার বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক। বিশিষ্ট ইসলামী পণ্ডিত শায়খ আলাউল হক তাঁর শাসনকালে পাণ্ডুয়াতে বসবাস করেন। শায়খ আলাউল হকের সুযোগ্য পুত্রও পাণ্ডুয়াতে থেকে সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামের জ্ঞান বিস্তারে মূল্যবান অবদান রাখেন।

সুলতান গিয়াসুদ্দীন আযম শাহ নানাভাবে হাজ যাত্রীদের খিদমাত করতেন। তাঁর অর্থানুকূল্যে মাক্কায় একটি ও মাদীনায় আরেকটি মাদ্রাসা ভবন নির্মিত হয়েছিলো।

সুলতান নিজে আরবী ও ফার্সী ভাষায় কবিতা লিখতেন। ইরানের কবি হাফিজের সংগে তিনি চিঠি বিনিময় করতেন।

তিনি ছিলেন একজন ন্যায় পরায়ন সুলতান। তিনি আইনের শাসনে বিশ্বাসী ছিলেন। একবার তাঁর নিক্ষিপ্ত একটি তীর এক বিধবার ছেলেকে আঘাত করে। বিধবা কাজী সিরাজুদ্দীনের আদালতে বিচার প্রার্থী হন। সম্মানিত কাজী সুলতানকে আদালতে ডেকে পাঠান। সুলতান আদালতে এলে কাজী তাঁকে উক্ত বিধবার প্রতি কৃত অন্যায়ের প্রতিকার করতে বলেন। সুলতান বিধবাকে প্রচুর অর্থ প্রদান করে সন্তুষ্ট করেন। কাজী যখন জানতে পারলেন যে বিধবা সন্তুষ্ট হয়েছেন তখন তিনি উঠে দাঁড়ান ও সুলতানকে তাঁর পাশে বসান। সুলতান তার পোশাকের ভেতর থেকে একটি তলোয়ার বের করে বলেন যে যদি কাজী আইনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে ব্যর্থ হতেন তাহলে এই তলোয়ার দিয়ে তাঁর মাথা কেটে ফেলতেন। কাজী তাঁর আসনের নীচ থেকে একটি বেত বের করে সুলতানকে দেখিয়ে বলেন যে তিনি আইনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে ব্যর্থ হলে এই বেত তাঁর পিঠে পড়তো। সুলতান কাজীর কথা শুনে খুবই খুশী হন। রিয়াদুস সালাতীন নামক গ্রন্থে এই কাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে।

গিয়াসুদ্দীন আযম শাহ মুসলিম দেশের শাসকদের সাথে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করতেন। চীন দেশের সাথেও তিনি দূত বিনিময় করতেন।

বাংলা ভাষার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে বাংলা ভাষায় রামায়ণ অনুবাদের জন্য তিনি কৃত্তিবাসকে আনুকূল্য প্রদান করেন।

গিয়াসুদ্দীন আযম শাহের শাসনকালে বাঙালাহ্ সালতানাত শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ দেশ ছিলো। মানুষ সুখে জীবন যাপন করতো।

খৃষ্টীয় ১৪১২ সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।

২৯. সাইফুদ্দীন হামযা শাহ, শিহাবুদ্দীন বায়েজিদ শাহ, রাজা কংস

খৃষ্টীয় ১৪১২ সনে সুলতান গিয়াসুদ্দীন আযম শাহের ইন্তিকালের পর তাঁর পুত্র সাইফুদ্দীন হামযা শাহ বাঙালাহর সুলতান হিসেবে পাভুয়ার মসনদে বসেন। তিনি পিতার যোগ্য ছেলে ছিলেন। সুলতানের সভাসদদের মধ্যে একটি ইসলামী গ্রুপ ছিলো। তিনি ছিলেন সেই গ্রুপেরই একজন। দরবারে ইসলাম বিদ্বেষী একটি গ্রুপও ছিলো। এই গ্রুপের নেতৃত্বে ছিলেন রাজা কংস বা গনেশ। রাজা কংস সাইফুদ্দীন হামযা শাহকে হত্যা করেন।

হামযা শাহের অনুগত ব্যক্তিত্ব শিহাবুদ্দীন রাজা কংসের চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। তিনি রাজা কংসের শক্তি খর্ব করতে সক্ষম হন। তিনি শিহাবুদ্দীন বায়েজিদ শাহ নামে পাভুয়ার মসনদে বসেন। রাজা কংস মরিয়া হয়ে উঠেন। তিনি তাঁর সমমনা ব্যক্তিদেরকে সংগঠিত করে সুলতানের ওপর হামলা চালান ও তাঁকে হত্যা করেন।

রাজা কংস এবার নিজেই পাভুয়ার মসনদে বসেন। ক্ষমতাসীন হয়ে তিনি মুসলিমদের ওপর অত্যাচারের স্টীম রোলার চালাতে থাকেন। বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিবর্গকে হত্যা করা হয়। শায়খ বদরুল ইসলাম ও তাঁর পুত্র শায়খ ফায়েদুল ইসলামকে রাজ-দরবারে নিয়ে হত্যা করা হয়। একদল ইসলামী ব্যক্তিত্বকে নৌকাতে উঠিয়ে নদীতে ডুবিয়ে মারা হয়। বহু মাসজিদ ভেংগে ফেলা হয়।

মুসলিমগণ শায়খ নূর কুত্বুল আলমের নেতৃত্বে সংগঠিত হন। শায়খ জৌনপুরের শাসক ইবরাহীম শার্কীকে বাঙালায় সামরিক অভিযান চালাবার আহ্বান জানান। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইবরাহীম শার্কী সসৈন্যে পাভুয়া পৌঁছেন। অবস্থা বেগতিক দেখে রাজা কংস শায়খ নূর কুত্বুল আলমের শরণাপন্ন হন। শায়খ তাঁকে ইসলাম গ্রহণ করতে বলেন। প্রথমে রাজি হয়ে তিনি পরে আবার অসম্মতি প্রকাশ করেন।

তবে আপন পুত্র যদুকে ইসলামে দীক্ষিত করে মসনদে বসাবার জন্য শায়খকে অনুরোধ করেন। শায়খ যদুকে মুসলিম বানিয়ে তাঁর নাম রাখেন জালালুদ্দীন মুহাম্মাদ। শায়খ ও তাঁর সাথীগণ তাঁকেই মসনদে বসান। পরিস্থিতি শান্ত হয়ে এলে ইবরাহীম শার্কী জৌনপুরে ফিরে যান।

জৌনপুর বাহিনী চলে যাওয়ার পর রাজা কংস আবার চক্রান্ত শুরু করেন। তিনি পুত্র যদুকে ইসলাম ত্যাগ করার জন্য চাপ দেন। কিন্তু যদু আন্তরিকভাবেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন বিধায় পিতার অন্যায় নির্দেশ মেনে নেননি। রাজা কংস তাঁর অনুগত ব্যক্তিদেরকে নিয়ে হামলা চালিয়ে আবার মুসলিম হত্যায় মেতে উঠেন। তিনি শায়খ নূর কুত্‌বুল আলমের পুত্র শায়খ আনোয়ার ও ভাতিজা শেখ জাহিদকে পাণ্ডুয়া থেকে বের করে দেন। কিছুকাল পর রাজা কংসের নির্দেশে সোনারগাঁওয়ে শায়খ আনোয়ারকে হত্যা করা হয়।

আর ঐ দিনই সুলতান জালালুদ্দিন তাঁর যালিম পিতা রাজা কংসকে হত্যা করে পাণ্ডুয়াতে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেন।

৩০. জালালুদ্দীন আবুল মুযাফফর মুহাম্মদ শাহ

খৃষ্টীয় ১৪১৫ সনে জালালুদ্দীন আবুল মুযাফফর মুহাম্মদ শাহ পাণ্ডুয়াতে তাঁর অবস্থান সুসংহত করেন।

বাঙালাহর বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ছিলো অমুসলিম। কিন্তু তারা মুসলিম শাসনের সুফল ভোগ করে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতো। মুসলিম সুলতানগণ কখনো তাদের ওপর যুলম করতেন না। তাই উগ্র হিন্দু রাজা কংস ও তাঁর অন্ধ অনুসারীরা যেই অরাজকতা সৃষ্টির প্রয়াস চালান তাতে সাধারণ হিন্দুগণ অংশ নিতে প্রস্তুত ছিলো না।

সুলতান জালালুদ্দীন নিষ্ঠাসহকারে ইসলামের অনুসরণ করতে থাকেন। রাজা কংস যেই সব মাসজিদ ধ্বংস করেছিলেন, তিনি সেইগুলো আবার তৈরি করেন। যেই সব মাসজিদের ক্ষতি করা হয়েছিলো সেই গুলো মেরামত করেন। তাছাড়া তিনি কয়েকটি নতুন মাসজিদও নির্মাণ করেন।

সুলতান জালালুদ্দীন পাণ্ডুয়া থেকে গৌড়ে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তিনি গৌড় শহরে দীঘি, মাসজিদ ও সরাইখানা নির্মাণ করেন।

জালালুদ্দীন নিজের জন্য 'সুলতান' ও 'আমীর' উভয় শব্দই ব্যবহার করতেন। খৃষ্টীয় ১৪৩১ সনে মুদ্রিত মুদ্রাতে 'খালীফাতুল্লাহ' উপাধি উৎকীর্ণ দেখা যায়।

সুলতান জালালুদ্দীন প্রায় বিশ বছর দেশ শাসন করেন। তাঁর শাসনকালে দেশে শান্তি বিরাজিত ছিলো। খৃষ্টীয় ১৪৩৪ সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।

৩১. শামসুদ্দীন আবুল মুজাহিদ আহমাদ শাহ

খৃষ্টীয় ১৪৩৪ সনে সুলতান জালালুদ্দীনের ইন্তিকাল হলে তাঁর চৌদ্দ বছরের ছেলে আহমাদ 'শামসুদ্দীন আবুল মুজাহিদ আহমাদ শাহ' উপাধি ধারণ করে বাঙালাহ সালতানাতের রাজধানী গৌড়ের মসনদে বসেন।

আহমাদ শাহ একজন অযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। কিছুকাল পর দুইজন ভৃত্য শাদী খান ও নাসির খান কর্তৃক তিনি নিহত হন। আবার, নাসির খান শাদী খানকে হত্যা করে মসনদে বসেন। কিন্তু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁর এই ধৃষ্টতা মেনে নিতে পারেন নি। এক সপ্তাহের মধ্যেই নাসির খান নিহত হন।

৩২. নাসিরুদ্দীন আবুল মুযাফফর মাহমুদ শাহ

খৃষ্টীয় ১৪৩৯ সনে গৌড়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ইলিয়াস শাহের অন্যতম বংশধর মাহমুদকে বাঙালাহ সালতানাতের সুলতান নির্বাচিত করেন। তিনি নাসিরুদ্দীন আবুল মুযাফফার মাহমুদ শাহ উপাধি ধারণ করে গৌড়ের মসনদে বসেন।

তাঁর সুযোগ্য শাসনে দেশে আবার শান্তি স্থাপিত হয়। তাঁর শাসনকালে খান জাহান আলী দক্ষিণ বংগের বাগেরহাট অঞ্চলে আসেন। তিনি ছিলেন ইসলামের শ্রেষ্ঠ মুবাল্লিগদের একজন। তাঁর প্রচেষ্টায় এই অঞ্চলে অতিদ্রুত ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ে। লোকেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। বিভিন্ন স্থানে মাসজিদ স্থাপন করে তিনি নও মুসলিমদের নৈতিক মান সমুন্নত করার ব্যবস্থা করেন। বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মাসজিদ খান জাহান আলীর স্মৃতিকে অম্লান করে রেখেছে। সেখানে জনগণের কল্যাণে দুইটি বড়ো দীঘিও খনন করেন।

নাসিরুদ্দীন আবুল মুযাফফার মাহমুদের শাসন কালে দেশের অন্যান্য স্থানেও বহু মাসজিদ নির্মিত হয়। অনেকগুলো ইসলামী শিক্ষালয় স্থাপিত হয়।

তিনি গৌড় শহরে প্রাসাদ ও দুর্গ নির্মাণ করেন। একটি মুদ্রাতে তাঁকে 'খালীফা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

খৃষ্টীয় ১৪৫৯ সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।

৩৩. রুকনুদ্দীন বারবাক শাহ

খৃষ্টীয় ১৪৫৯ সনে সুলতান নাসিরুদ্দীনের পুত্র রুকনুদ্দীন বারবাক শাহ বাঙালাহ সালতানাতের সুলতান হিসেবে গৌড়ের মসনদে বসেন। তাঁর শাসনকালে আরব দেশ থেকে শাহ ইসমাঈল গাজী একশত বিশজন মুবাল্লিগ নিয়ে গৌড় আসেন। শাহ ইসমাঈল ও তাঁর সাথীগণ একদিকে ছিলেন মুবাল্লিগ, অন্যদিকে ছিলেন মুজাহিদ।

তাঁরা উড়িশা অঞ্চলে মুসলিম প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ

করেন। কামরূপের রাজা বাঙালাহর সীমান্তের ওপর চাপ সৃষ্টি করলে তাঁকে প্রতিহত করার জন্য সুলতান শাহ্ ইসমাঈল গাজীকে সসৈন্যে প্রেরণ করেন। তিনি বড় পাইকা ও জলা মাকাম দুর্গ নির্মাণ করেন। কামরূপের রাজার একজন সেনাপতি শাহ্ ইসমাঈল গাজীর চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

তবে একজন হিংসুটে হিন্দুর হীন চক্রান্তে তিনি শহীদ হন। হিন্দু ব্যক্তিটি সুলতানকে এই মিথ্যা খবর দেয় যে শাহ্ ইসমাঈল গাজী কামরূপের রাজার সাথে মৈত্রী গড়ে তুলে সীমান্ত অঞ্চলে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করতে চান। এই খবরে বিভ্রান্ত হয়ে সুলতান একদল সৈন্য পাঠিয়ে তাঁর ওপর হামলা চালান। খৃষ্টীয় ১৪৭৪ সনে শাহ্ ইসমাঈল গাজী শাহাদাত বরণ করেন।

সিলেটেও সুলতান রুকনুদ্দীন বারবাক শাহের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিলো। তাঁর শাসন কালে আরাকানের রাজা মুসলিমদের হাত থেকে চট্টগ্রাম ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হন।

তাঁর শাসনকালে বহু সংখ্যক হাবশী বাঙালাহ্ সালতানাতে আসে। সুলতান আট হাজার হাবশীকে তাঁর সেনাবাহিনীতে ভর্তি করেন।

সুলতান রুকনুদ্দীন একজন উদারচিত্ত, বিচক্ষণ ও ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন। তাঁর শাসনকালেও দেশে বহু মাসজিদ নির্মিত হয়। খৃষ্টীয় ১৪৭৫ সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।

৩৪. শামসুদ্দীন আবুল মুযাফফার ইউসুফ শাহ

খৃষ্টীয় ১৪৭৫ সনে রুকনুদ্দীন বারবাক শাহের ইন্তিকাল হলে তাঁর পুত্র ইউসূফ 'শামসুদ্দীন আবুল মুযাফফার ইউসূফ শাহ' উপাধি ধারণ করে বাঙালাহ সালতানাতের সুলতান হিসেবে গৌড়ের মসনদে বসেন। সুলতান ইউসূফ ইসলামী শারীয়াহর একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন। তিনি সালতানাতে ইসলামী বিধি বিধান সঠিক ভাবে পালিত হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য বহু আলিমের ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত করেন।

তাঁর শাসনকালে বাঙালাহ্ একটি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। মদপান কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ হয়। লোকদের নৈতিক মানোন্নয়নের প্রয়োজনে বহু মাসজিদ নির্মাণ করা হয়। তাঁর শাসনকালে দেশে শান্তি বিরাজমান ছিলো। একটি লিপিতে সুলতান ইউসূফ শাহকে 'খালীফাতুল্লাহ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ১৪৮১ সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।

৩৫. জালালুদ্দীন আবুল মুযাফফার ফাতেহ শাহ

খৃষ্টীয় ১৪৮১ সনে গৌড়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সুলতান মাহমুদ শাহের অন্যতম পুত্র ফাতেহ শাহকে বাঙালাহর সুলতান নির্বাচিত করেন। তিনি জালালুদ্দীন আবুল

মুযাফফার ফাতেহ্ শাহ্ উপাধি ধারণ করে গৌড়ের মসনদে বসেন।

তাঁর শাসনকালেও সালতানাতে বহু সংখ্যক মাসজিদ তৈরি হয়। দেশের সর্বত্র দ্রুততার সাথে ইসলামের প্রসার ঘটে ও মুসলিম বসতি গড়ে উঠে।

তবে রাজধানীতে হাবশী সৈন্যরা প্রতাপশালী হয়ে উঠে। প্রাসাদ রক্ষীদের হাবশী কমাণ্ডার শাহ্জাদা সুলতানের বিরুদ্ধে চক্রান্তে মেতে ওঠে। একদিন সে সুলতানকে হত্যা করে বসে।

খৃষ্টীয় ১৪৮৭ সনে সুলতান ফাতেহ্ শাহ্ শহীদ হন।

৩৬. সুলতান বারবাক শাহ্

খৃষ্টীয় ১৪৮৭ সনে হাবশী সৈন্যদের কমাণ্ডার শাহ্জাদা সুলতান বারবাক শাহ্ উপাধি ধারণ করে গৌড়ের মসনদে বসেন। কিন্তু সাবেক সুলতানের অনুগত হাবশী কমাণ্ডার মালিক আনদিল ছয় মাসের মধ্যেই তাঁকে হত্যা করেন।

৩৭. সাইফুদ্দিন আবুল মুযাফফার ফিরোজ শাহ্ (২য়)

খৃষ্টীয় ১৪৮৭ সনে গৌড়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ মালিক আনদিলকেই বাঙালাহ্ সালতানাতের সুলতান নির্বাচন করেন। তিনি সাইফুদ্দীন আবুল মুযাফফার ফিরোজ শাহ্ (২য়) উপাধি ধারণ করে গৌড়ের মসনদে বসেন।

তিনি একজন যোগ্য ও ন্যায়পরায়ণ সুলতান ছিলেন। তিনি ছিলেন অভাবী মানুষদের বন্ধু। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় অনেকগুলো মাসজিদ নির্মিত হয়। রাজধানী গৌড় শহরে তিনি একটি মাসজিদ ও একটি উচ্চ মিনার তৈরি করেন। ফিরোজ মিনার এখনো তাঁর স্মৃতি বুকে নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

বাঙালাহ্ সালতানাতের হাবশী সুলতানদের মধ্যে তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্ব।

খৃষ্টীয় ১৪৮৯ সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।

৩৮. নাসিরুদ্দীন আবুল মুযাফফার মাহমুদ শাহ্ (২য়)

খৃষ্টীয় ১৪৯০ সনে তিনি বাঙালাহর সুলতান হন। তিনি রাজধানী গৌড়ে একটি মাসজিদ নির্মাণ করেন।

খৃষ্টীয় ১৪৯১ সনে সিদি বদর তাঁকে হত্যা করেন।

৩৯. শামসুদ্দীন মুযাফফার শাহ্ সিদি বদর

খৃষ্টীয় ১৪৯১ সনে সিদি বদর শামসুদ্দীন মুযাফফার শাহ্ উপাধি ধারণ করে বাঙালাহর সুলতান রূপে গৌড়ের মসনদে বসেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় শায়খ নূর কুতবুল আলমের বংশধর শায়খ গাউস দেশে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

সাইয়েদ হুসাইন নামক একজন আরব বংশীয় উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি তাঁর শাসনকালের শেষভাবে সালতানাতে গোলযোগ সৃষ্টি করেন। অচিরেই গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। এই গৃহযুদ্ধ চারমাস স্থায়ী হয়। অবশেষে সুলতান বিদ্রোহীদের হাতে প্রাণ হারান।

৪০. আলাউদ্দীন হুসাইন শাহ্

খৃষ্টীয় ১৪৯৪ সনে আরব বংশীয় সাইয়েদ হুসাইন 'আলাউদ্দীন হুসাইন শাহ' উপাধি ধারণ করে বাঙালাহ্ সালতানাতের সুলতান হিসেবে গৌড়ের মসনদে বসেন।

তিনি গৌড় থেকে একডালাতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

তিনি হাবশীদের ওপর খুব বিরক্ত ছিলেন। তিনি তাদেরকে বাঙালাহ্ ছেড়ে চলে যাবার নির্দেশ দেন। তারা দলে দলে দাক্ষিণাত্যে চলে যায়।

আলাউদ্দীন হুসাইন শাহের শাসনকালেই বাঙালাহর উপকূল অঞ্চলে ইউরোপীয় দেশ পর্তুগাল থেকে আগত পর্তুগীজ জলদস্যুদের উপদ্রবের সূচনা হয়।

তাঁর শাসনকালে শ্রী চৈতন্যদেব বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন। নবদ্বীপ ছিলো তাঁর প্রধান কেন্দ্র। তবে তিনি স্বাধীনভাবে সারা দেশ ঘুরে বেড়াতেন। ইসলামের প্রসার রোধের উদ্দেশ্যেই তিনি এই আন্দোলন শুরু করেছিলেন। এই আন্দোলন উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের ওপর তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি। বরং পর্তুগীজ পর্যটক বারবোসা লিখেছেন যে শাসকদের আনুকূল্য লাভের জন্য প্রতিদিন বহু হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করতো। আর যেহেতু সরকারী আনুকূল্য লাভের যোগ্যতা সাধারণ কোন ব্যক্তির থাকেনা, সেহেতু প্রতীয়মান হয় যে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্য থেকেই বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করতো।

আলাউদ্দীন হুসাইন শাহ হিন্দুদের প্রতি খুবই উদার ছিলেন। তাঁর সভাসদদের মধ্যে বহু হিন্দু ছিলো। তাঁর অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন পুরন্দর খান। ত্রিপুরা অভিযানে সেনাপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন গৌরমল্লিক। অনুপ ছিলেন মুদ্রাশালার প্রধান কর্মকর্তা। তাঁর দেহরক্ষী ছিলেন কেশব ছত্রী।

ইতিমধ্যে দিল্লীতে লোদী বংশের রাজত্ব কায়েম হয়। দিল্লীর সুলতান সিকান্দার লোদী পার্শ্ববর্তী জৌনপুর সালতানাত আক্রমণ করেন। জৌনপুরের সুলতান হুসাইন শাহ্ শার্কী বাঙালাহ্ সালতানাতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে সিকান্দার লোদী সেনাপতি মাহমুদ খান ও মুবারক খান লোহানীর নেতৃত্বে বাঙালাহ্ অভিমুখে সৈন্য প্রেরণ করেন। আলাউদ্দীন হুসাইন শাহ্ বাঙালাহর স্বাধীনতা হিফাজাতের জন্য ছিলেন দৃঢ় সংকল্প। তিনি তাঁর পুত্র দানিয়েলের নেতৃত্বে দিল্লীর সৈন্য বাহিনীর মুকাবিলার জন্য একদল সৈন্য পাঠান। উভয় বাহিনীর মুকাবিলা হয় বিহারে। অবশেষে একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এই মর্মে যে দিল্লী সালতানাত

বাঙালাহর ব্যাপারে নাক গলাবে না, বাঙালাহ সালতানাতও দিল্লী সালতানাতের ব্যাপারে নাক গলাবে না।

বাঙালাহর গা ঘেঁষে আসামের যেই অংশটি রয়েছে সেইটির নাম ছিলো কামতা (বর্তমান গোয়ালপাড়া অঞ্চল)। আরো এগিয়ে বারনাদি ও মনসা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলকে বলা হতো কামরূপ। কামতা-কামরূপ রাজ্যে তখন খেন বংশের রাজা নীলাম্বর ক্ষমতাসীন ছিলেন। রাজা নীলাম্বরের একজন মন্ত্রীর আহবানে সাড়া দিয়ে আলাউদ্দীন হুসাইন শাহ সামরিক অভিযান চালিয়ে উক্ত রাজ্যের রাজধানী কামতাপুর দখল করেন। আসামের মূলখন্ডের দিকেও তিনি সৈন্য পাঠান। তবে তা ফলপ্রসূ হয়নি।

ত্রিপুরার রাজা ধান্য মানিক্য বাঙালাহ সালতানাতের পূর্ব সীমান্তের কিছু অংশ দখল করেন। এই সময় ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী ছিলো রাঙামাটি। আরাকানের মগ সৈন্যরা চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো। ত্রিপুরার সৈন্যগণ আক্রমণ চালিয়ে চট্টগ্রাম দখল করে নেয়। যুবরাজ নুসরাত শাহ চট্টগ্রাম পুনর্দখল করে এটিকে দারুল ইসলামে পরিণত করেন। এই যুদ্ধে আলফা হুসাইনী নামক একজন আরব ব্যবসায়ী জাহাজ ও প্রয়োজনীয় উপকরণ দিয়ে নুসরাত শাহকে সাহায্য করেন। খৃষ্টীয় ১৫১৬ সনে চট্টগ্রাম পুনরায় বাঙালাহ সালতানাতের অধীনে আসে। পর্তুগীজ নাবিক জো-দা-সিলভেরিয়া জানান যে খৃষ্টীয় ১৫১৭ সনে চট্টগ্রাম এসে তিনি এটিকে বাঙালাহর সুলতানের অধীনে দেখতে পান।

আলাউদ্দীন হুসাইন শাহ পরাগল খানকে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। পরাগল খান সীতাকুন্ড পাহাড়ে ঘাঁটি স্থাপন করে চট্টগ্রাম অঞ্চল শাসন করতে থাকেন। তাঁর পরে ঐ অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন ছুটি খান। কর্ণফুলী নদীর তীরভাগ পর্যন্ত তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিলো।

সুলতান আলাউদ্দীন হুসাইন শাহ 'খালীফাতুল্লাহ', 'আলমুজাহিদু ফী সাবীলির রাহমান', 'গাউসুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন' ইত্যাদি উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জারিকৃত কোন কোন মুদ্রায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' - কালেমা অংকিত ছিলো, কোন কোনটিতে ছিলো ইসলামের সোনালী যুগের চার খালীফাহর নাম। তাঁর জারিকৃত এমন ত্রিশটি মুদ্রা পাওয়া গেছে যেইগুলো মাসজিদ নির্মাণের সাথে সম্পর্কিত। তাঁর সময়ে গৌড়ের ছোট সোনা মাসজিদ নির্মিত হয়। তিনি গৌড়ের নিকটে একটি মাদ্রাসাও স্থাপন করেন 'লি তাদরীসি উলুমুদ্দীন ওয়া তা'লীমে আহকামিল ইয়াকীন'।

আলাউদ্দীন হুসাইন শাহ বাংলাভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতির ক্ষেত্রে অবদান রাখেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু কবি মালাধর বসু বাংলা ভাষায় ভগবৎ গীতা অনুবাদ

করেন। কবি মালাধর বসু, বিপ্রদাস ও যশোরাজ খান সুলতানের নাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতেন। কবি বিজয়গুপ্ত সুলতান আলাউদ্দীন হুসাইন শাহকে 'নরপতি তিলক' ও 'জগৎ ভূষণ' আখ্যা দেন।

চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খান ও ছুটি খান কবি পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দীকে বাংলা ভাষায় মহাভারত অনুবাদ করতে উৎসাহিত করেন।

সুলতান আলউদ্দীন হুসাইন শাহের ছাব্বিশ বছরের শাসনকালে দেশে শান্তি-শৃংখলা বিরাজমান ছিলো। তিনি নিরপেক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার কার্য পরিচালনা করতেন। খৃষ্টীয় ১৫২০ সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।

৪১. নাসিরুদ্দীন আবুল মুযাফফার নুসরাত শাহ

খৃষ্টীয় ১৫২০ সনে আলাউদ্দীন হুসাইন শাহের ইন্তিকাল হলে তাঁর সভাসদগণ তাঁর পুত্র নুসরাত শাহকে বাঙালাহ্ সালতানাতের সুলতান নির্বাচিত করেন। তিনি নাসিরুদ্দীন আবুল মুযাফফার নুসরাত শাহ উপাধি ধারণ করে মসনদে বসেন। মনে হয় তিনি একডালা থেকে রাজধানী গৌড়ে স্থানান্তরিত করেন।

গৌড়ের বড় সোনা মাসজিদ তাঁর স্মৃতি বহন করছে। তাঁর নির্দেশে সালতানাতের বিভিন্ন স্থানে বহু মাসজিদ নির্মিত হয়।

তিনি আলিমদের কদর করতেন। প্রখ্যাত হাদীসবিদ ও ফিকাহবিদ তাকীউদ্দীন ইবনু আইনুদ্দীনকে তিনি প্রধান সভাসদের মর্যাদা দেন।

উল্লেখ্য যে নাসিরুদ্দীন আবুল মুযাফফার নুসরাত শাহ যখন বাঙালাহ্র সুলতান তখন খৃষ্টীয় ১৫২৬ সনে দিল্লীর সুলতান ইবরাহীম লোদীকে পানিপথ রণাংগনে পরাজিত করে জহিরুদ্দীন মুহাম্মাদ বাবুর দিল্লীতে মুগল শাসন পত্তন করেন।

এই সময় বিভিন্ন দেশ থেকে বহু সংখ্যক মুসলিম বাঙালাহ্ সালতানাতে এসে বসতি স্থাপন করে। বিশেষ করে মুগলদের চাপের মুখে বহু সংখ্যক আফগান এই দেশে চলে আসে।

পিতার মতো নুসরাত শাহ বাংলা ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। কবি শেখর একজন রাজ-কর্মচারী ছিলেন।

তাঁর শাসনকালে উপকূল অঞ্চলে পর্তুগীজ জলদস্যুদের উৎপাত বৃদ্ধি পায়। খৃষ্টীয় ১৫২৬ সনে একদল পর্তুগীজ চট্টগ্রাম উপকূলে কিছু সংখ্যক বাণিজ্য জাহাজ লুণ্ঠন করে।

খৃষ্টীয় ১৫৩২ সনে তিনি একজন ভৃত্যের হাতে নিহত হন।

৪২. আলাউদ্দীন আবুল মুযাফফার ফিরোজ শাহ

খৃষ্টীয় ১৫৩২ সনে সুলতান নুসরাত শাহের পুত্র ফিরোজ শাহ 'আলাউদ্দীন আবুল মুযাফফার ফিরোজ শাহ' উপাধি ধারণ করে বাঙালাহ্র সুলতান হিসেবে গৌড়ের মসনদে বসেন।

দাদা ও পিতার মতো তিনিও বাংলা সাহিত্যের ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তবে তাঁর শাসনকাল ছিলো খুবই সংক্ষিপ্ত। খৃষ্টীয় ১৫৩৩ সনে তিনি নিহত হন।

৪৩. গিয়াসুদ্দীন আবুল মুযাফফার মাহমুদ শাহ (৩য়)

খৃষ্টীয় ১৫৩৩ সনে মাহমুদ শাহ 'গিয়াসুদ্দীন আবুল মুযাফফার মাহমুদ শাহ' উপাধি ধারণ করে গৌড়ের মসনদে বসেন।

তাঁর শাসনকালে দিল্লীর মুগল সুলতান নাসিরুদ্দীন মুহাম্মদ হুমায়ূন ও সাসারামের (বিহারের অন্তর্গত) আফগান (পাঠান) নেতা শের খানের মধ্যে বিরোধ বাঁধে। শক্তি সঞ্চয় করে শের খান বাঙালাহ সালতানাতের বিহার অঞ্চলের একাংশের ওপর নিজের কর্তৃত্ব স্থাপন করেন।

অপর দিকে পর্তুগীজদের উপদ্রব বেড়ে যায়। খৃষ্টীয় ১৫৩৩ সনে পাঁচটি জাহাজে করে দুই শত পর্তুগীজ চট্টগ্রাম বন্দরে পৌছে। তারা একদিকে অবৈধ ব্যবসা চালাতে থাকে অপর দিকে সুলতানকে তুষ্ট করার জন্য গৌড়ে তাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করে। তাদের অসাধুতা প্রমাণিত হলে গৌড়ে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ভারতের পশ্চিম উপকূলে গোয়াতে অবস্থিত তাদের প্রধান ঘাঁটি থেকে পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ খৃষ্টীয় ১৫৩৪ সনে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে একদল নৌ-যোদ্ধা প্রেরণ করে। তারা চট্টগ্রাম বন্দরে নেমে নির্বিবাদে লোক হত্যা করে, লুটতরাজ চালায় ও ঘরদোরে আগুন ধরিয়ে দেয়। বিহারের দিক থেকে চলছিলো শের খানের প্রবল সামরিক চাপ। একই সময় দুই দিক সামলানো ছিলো কঠিন। তাই সুলতান মাহমুদ শাহ পর্তুগীজদের সাথে সমঝোতা করতে বাধ্য হন। তিনি পর্তুগীজদেরকে চট্টগ্রাম ও সাতগাঁওতে ঘাঁটি স্থাপনের অনুমতি দেন। বাঙালাহ সালতানাতে এই দুইটি ছিলো ইউরোপীয়দের প্রথম ঘাঁটি।

খৃষ্টীয় ১৫৩৬ সনে শের খান সসৈন্যে গৌড় পৌছেন। প্রচুর অর্থ-সম্পদের বিনিময়ে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। শের খান বিহারে ফিরে যান। কিন্তু ১৫৩৭ সনে তিনি আবার গৌড় আক্রমণ করেন। ঠিক ঐ সময় দিল্লীর সুলতান নাসিরুদ্দীন মুহাম্মাদ হুমায়ূন বিহার আক্রমণ করেন। শেরখান তাঁর ছেলে জালাল খান ও সেনাপতি খাওয়াস খানকে গৌড়ের অবরোধে রেখে নিজে চুনারের দিকে যান। কিন্তু চুনার হুমায়ূনের হস্তগত হয়। অপর দিকে গৌড় শের খানের বাহিনীর হস্তগত হয়।

খৃষ্টীয় ১৫৩৮ সনে বাঙালাহ সালতানাত শের খানের পদানত হয়। মাহমুদ শাহ উত্তর বিহারের দিকে পালিয়ে যান। সেখানে ভগ্ন হৃদয়ে তিনি ইন্তিকাল করেন।

৪৪. ফরিদুদ্দীন আবুল মুয়াফফার শেরশাহ্

খৃষ্টীয় ১৫৩৮ সনের ছয়ই এপ্রিল শের খান বিজয়ী বেশে বাঙালাহ্ সালতানাতের রাজধানী গৌড় শহরে প্রবেশ করেন।

ঐ সময় দিল্লীর সুলতান নাসিরুদ্দীন মুহাম্মাদ হুমায়ূন শক্তি সঞ্চয় করে সসৈন্যে গৌড়ের উপকণ্ঠে পৌঁছেন। শেরখান এই আক্রমণ প্রতিহত করতে পারবেন না ভেবে গৌড় শহর লুণ্ঠন করেন ও শহরটি পুড়িয়ে দেন। লুণ্ঠিত সম্পদ নিয়ে তিনি বিহারের দিকে চলে যান। হুমায়ূন ভস্মিভূত ও লুণ্ঠিত শহরে প্রবেশ করেন। তিনি রাস্তাঘাট ও বিধ্বস্ত প্রাসাদগুলো পুনঃ নির্মাণের ব্যবস্থা করেন। শেরখান কর্তৃক বিধ্বস্ত হওয়ার পরও গৌড় শহরের অবশিষ্ট সম্পদ ও সবুজ সৌন্দর্য দেখে হুমায়ূন মুগ্ধ হন এবং এর নাম রাখেন জান্নাতাবাদ। তিনি সৈন্য প্রেরণ করে সোনারগাঁও ও চট্টগ্রাম তাঁর নিয়ন্ত্রণে আনেন এবং উভয় স্থানে দক্ষ প্রশাসক নিযুক্ত করেন। এই প্রথমবার বাঙালাহ্ মুগলদের পদানত হয়। তবে হুমায়ূন এই বিজয় বেশি দিন ধরে রাখতে পারেন নি।

শের খান দক্ষিণ বিহার জয় করে রোহতাস দুর্গ দখল করেন। আগ্রাতে হুমায়ূনের ভাই বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এই পরিস্থিতিতে হুমায়ূন বাঙালাহ্ ছেড়ে যেতে বাধ্য হন।

পথিমধ্যে শের খানের সাথে একটি শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু শের খান এই চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করেননি।

খৃষ্টীয় ১৫৩৯ সনের ২৬শে জুন। হুমায়ূন ও তাঁর বাহিনী যখন সালাতুল ফাজরের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখন শেরখান অতর্কিত হামলা চালিয়ে মুগল সৈন্যদেরকে ছত্রভংগ করে দেন। বহু মুগল সৈন্য নিহত হয়।

সুলতান হুমায়ূন নিজাম নামক এক মশকওয়ালার মশকে ভর করে স্বল্প সংখ্যক সৈন্যসহ নদী পার হয়ে আগ্রার দিকে অগ্রসর হন। শের খান দ্রুত এগিয়ে এসে মুগল প্রশাসক ও সৈন্যদেরকে হত্যা করে বাঙালাহ্ দখল করেন। অতপর তিনি ফরিদউদ্দীন আবুল মুযাফফার শেরশাহ্ উপাধি ধারণ করে গৌড়ের মসনদে বসেন।

এইভাবে বাঙালাহ্ আফগান (পাঠান) শাসনাধীন হয়। শেরশাহ্ দেশটিকে কয়েকটি সরকার বা প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত করেন। প্রতিটি সরকারে একজন আফগান (পাঠান) শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তিনি দিল্লীতেও তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন।

খৃষ্টীয় ১৫৪৫ সনে (উত্তর প্রদেশের) কালিঞ্জর দুর্গ দখল করতে গিয়ে একটি বিস্ফোরণে আহত হয়ে শেরশাহ্ ইন্তিকাল করেন। তাঁর পুত্র জালাল খান ইসলাম শাহ্ উপাধি ধারণ করে দিল্লীর মসনদে বসেন।

৪৫. মুহাম্মাদ খান শূর

খৃষ্টীয় ১৫৪৫ সনে দিল্লীর আফগান (পাঠান) সুলতান জালালুদ্দীন আবুল মুযাফফার ইসলাম শাহ (জালাল খান) মুহাম্মাদ খান শূরকে বাঙালাহর গভর্ণর নিযুক্ত করেন। ইসলাম শাহ বিহারে গভর্ণর নিযুক্ত করেন সুলাইমান কররানীকে। মুহাম্মাদ খান শূরের শাসনকালে ভুলুয়া (নোয়াখালী)– চট্টগ্রাম অঞ্চল অশান্ত হয়ে ওঠে। এই অঞ্চলে কখনো আরাকানের মগ, কখনো বা পর্তুগীজদের দৌরাত্ম দেখা দেয়। কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণও বিদ্রোহের পতাকা উড়ান। ঢাকা-মোমেনশাহী অঞ্চলে সুলাইমান খান নামক এক ব্যক্তি স্বাধীনভাবে শাসনকার্য চালাতে থাকেন।

সুলতান ইসলাম শাহ তাজ খান ও দরিয়া খানের নেতৃত্বে একটি সৈন্য দল প্রেরণ করেন সুলাইমানের বিরুদ্ধে। যুদ্ধে সুলাইমান খান নিহত হন। তাঁর দুই পুত্র হচ্ছেন ঈসা খান ও ইসমাঈল খান। পূর্ব বাঙালাহতে ঈসা খান একজন শক্তিশালী শাসক হিসেবে আবির্ভূত হন।

ইসলাম শাহের পর মুবারিয খান 'মুহাম্মাদ শাহ আদিল' উপাধি ধারণ করে দিল্লীর মসনদে বসেন।

বাঙালাহর গভর্ণর মুহাম্মাদ খানশূর স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং শামসুদ্দীন আবুল মুযাফফার মুহাম্মাদ শাহ উপাধি ধারণ করেন।

খৃষ্টীয় ১৫৫৫ সনে উত্তর ভারতে দিল্লীর সৈন্যদের সাথে যুদ্ধে তিনি নিহত হন।

৪৬. গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ

খৃষ্টীয় ১৫৫৫ সনে দিল্লীর সুলতান শাহবাজ খানকে বাঙালাহর গভর্ণর নিযুক্ত করেন। তিনি যথারীতি গৌড়ে পৌঁছেন। অপরদিকে মুহাম্মাদ শাহের অনুগত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যোশি নামক স্থানে মিলিত হয়ে তাঁর পুত্র খিজির খানকে বাঙালাহর সুলতান নির্বাচিত করেন। তিনি গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ উপাধি ধারণ করেন এবং রাজধানী গৌড়ের দিকে সসৈন্যে অগ্রসর হন। যুদ্ধে দিল্লীর নিযুক্ত গভর্ণর শাহবাজ খান নিহত হন। গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ স্বাধীন সুলতান রূপে দেশ শাসন করতে থাকেন।

গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ রাজমহলে একটি, রাজশাহীর কুসুম্বাতে একটি ও বর্ধমানের কালনাতে একটি মাসজিদ নির্মাণ করেন।

তিনি খৃষ্টীয় ১৫৬০ সন পর্যন্ত বাঙালাহর সুলতান ছিলেন।

৪৭. গিয়াসুদ্দীন আবুল মুযাফফার জালাল শাহ

খৃষ্টীয় ১৫৬০ সনে বাহাদুর শাহের ভাই জালাল শাহ 'গিয়াসুদ্দীন আবুল মুযাফফার জালালশাহ' উপাধি ধারণ করে বাঙলাহর সুলতান হিসেবে গৌড়ের মসনদে বসেন।

তিনি দিল্লীর সুলতান আকবরের সংগে সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলেন।

খৃষ্টীয় ১৫৬৩ সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।

৪৮. তাজ খান কররানী

খৃষ্টীয় ১৫৬৩ সনে জালাল শাহের ইন্তিকাল হলে তাঁর পুত্র গৌড়ের মসনদে বসেন, কিন্তু অল্পকাল পরেই গিয়াসুদ্দীন নামক এক ব্যক্তির হাতে নিহত হন।

এমতাবস্থায় দক্ষিণ বিহারের গভর্ণর সুলাইমান খান কররানী তাঁর ভাই তাজ খান কররানীর সেনাপতিত্বে গৌড়ের দিকে একদল সৈন্য পাঠান। যুদ্ধে গিয়াসুদ্দীন নিহত হন। তাজ খান কররানী গৌড়ের মসনদে বসেন।

কিন্তু ঐ বছরই তিনি ইন্তিকাল করেন।

৪৯. সুলাইমান খান কররানী

খৃষ্টীয় ১৫৬৩ সনে বিহারের শাসক সুলাইমান খান কররানী বাঙালাহর শাসন ভার নিজের হাতে তুলে নেন। এইভাবে বিহার ও বাঙালাহ আবার একটি রাজ্যে পরিণত হয়।

সুলাইমান খান কররানী আগ্রার সুলতান জালালুদ্দীন মুহাম্মাদ আকবরের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করেন। তিনি স্বাধীনভাবে বিহার ও বাঙালাহ শাসন করছিলেন, কিন্তু কৌশলগত কারণে 'সুলতান' উপাধি ধারণ করেননি।

উড়িশার মুকুন্দ দেব সুলাইমান খান কররানীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। সুলাইমান খান তাঁর পুত্র বায়েজিদকে উড়িশার দিকে প্রেরণ করেন। তাঁর সহকারী রূপে প্রেরিত হয়েছিলেন নও মুসলিম ব্রাহ্মণ কালাপাহাড়।

পরবর্তী সময়ে সুলাইমান খান কররানী নিজেই সসৈন্যে উড়িশা আসেন ও শত্রু পক্ষকে পরাজিত করে রাজধানী তাজপুর দখল করেন। এইভাবে বিহার ও বাঙালাহর সাথে উড়িশাও যুক্ত হয়।

সুলাইমান খান কররানী তান্ডা নামক স্থানে একটি নতুন শহর গড়ে তুলে গৌড় থেকে সেখানে সালতানাতের রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

উল্লেখ্য যে সুলাইমান খান কররানী একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম ছিলেন। তিনি সালতানাতে ইসলামী শারীয়াহ কার্যকর করেন। প্রতিদিন সকাল বেলা তিনি একশত পঞ্চাশ জন আলিমের সাথে আলোচনা করতেন।

খৃষ্টীয় ১৫৭৩ সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।

৫০. বায়েজিদ খান কররানী

খৃষ্টীয় ১৫৭৩ সনে সুলাইমান খান কররানীর পুত্র বায়েজিদ খান কররানী বাঙালাহর সুলতান হিসেবে তান্ডার মসনদে বসেন। তিনি আগ্রার সুলতানের প্রতি আনুগত্য

প্রদর্শনে নারাজ ছিলেন। তবেঅল্প কাল পরেই তিনি এক কুচক্রী আত্মীয়ের হাতে নিহত হন।

৫১. দাউদ খান কররানী

খৃষ্টীয় ১৫৭৩ সনে লোদী খানের নেতৃত্বে সভাসদগণ একত্রিত হয়ে বায়েজিদ শাহের হত্যাকারীকে হত্যা করে বায়েজিদ খানের ছোট ভাই দাউদ খান কররানীকে বাঙালাহর সুলতান নির্বাচন করেন। তিনিও তাঁর ভাইয়ের মতো স্বাধীন-চেতা ছিলেন।

গুজরাট বিজয়ের পর আগ্রার সুলতান জালালুদ্দীন মুহাম্মাদ আকবর মোটামুটি নির্বিঘ্ন হন। এবার তিনি বাঙালাহ-বিহার-উড়িশার দিকে নজর দেন।

খৃষ্টীয় ১৫৭৪ সনে তিনি তাঁর সেনাপতি মুনীম খানকে বাঙালাহ সালতানাত আক্রমণের জন্য পাঠান। মুনীম খান প্রথমে পাটনার দিকে আসেন। দাউদ খান কররানী পাটনায় গিয়ে মুগল বাহিনীর মুকাবিলা করেন। মুনীম খান পাটনা অবরোধ করেন। অবরোধ দীর্ঘস্থায়ী হয়। এবার আকবর নিজেই এক বিশাল বাহিনী নিয়ে পাটনা আসেন। দাউদ খান কররানী পাটনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন।

মুনীম খান সামরিক অভিযান অব্যাহত রাখেন। খৃষ্টীয় ১৫৭৪ সনের অকটোবর মাসে মুনীম খান বাঙালাহর রাজধানী তান্ডা দখল করেন। দাউদ খান কররানী উড়িশা চলে যান। মুনীম খান সেখানেও আক্রমণ চালান। অবশেষে একটি শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাঙালাহ ও বিহার মুগলদের হাতে চলে যায়। কেবল উড়িশার ওপর দাউদ খান কররানীর কর্তৃত্ব স্বীকৃত হয়।

খৃষ্টীয় ১৫৭৫ সনে মুনীম খান তান্ডাতে ইন্তিকাল করেন।

মুনীম খানের ইন্তিকালের খবর পেয়ে দাউদ খান কররানী উড়িশা থেকে এসে তান্ডা আক্রমণ ও দখল করেন। পশ্চিম বংগ, উত্তর বংগ ও উড়িশার ওপর তিনি কর্তৃত্বশীল হন। পূর্ব বংগে মুগল সেনাপতি শাহ বারদী ঈসা খানের প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। ঈসা খান ঐ অঞ্চল থেকে মুগল সৈন্যদেরকে তাড়িয়ে দেন।

এবার আকবর খান জাহান হুসাইন কুলী বেগকে সেনাপতি করে পাঠান। আগ্রার সৈন্য ও বাঙালাহর সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয়। আকবর সেনাপতি মুযাফফার খান তুরবাতির নেতৃত্বে দাউদ খান কররানীর বিরুদ্ধে নতুন সৈন্য দল পাঠান।

খৃষ্টীয় ১৫৭৬ সনের বারই জুলাই রাজমহলে প্রচন্ড যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে সুলতান দাউদ খান কররানী পরাজিত ও বন্দী হন। তাঁকে মৃত্যু দন্ড দেয়া হয়। এইভাবে দ্বিতীয় বারের মতো বাঙালাহ মুগলদের কর্তৃত্বাধীনে চলে যায়।

৫২. খান জাহান হুসাইন কুলী বেগ

খৃষ্টীয় ১৫৭৬ সনে আগ্রার সুলতান জালালুদ্দীন মুহাম্মাদ আকবর খান জাহান হুসাইন কুলী বেগকে শুবা বাঙালাহর শুবাদার নিযুক্ত করেন। বিহার ও উড়িশাও তাঁর শাসনাধীন ছিলো।

বাঙালাহর সুলতান দাউদ খান কররানীর হত্যা মুগল বিরোধী তৎপরতা বন্ধ করতে পারেনি। সারা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আফগান (পাঠান) আমীরগণ তাঁদের অনুগত সৈন্যদেরকে নিয়ে মুগল সৈন্যদের মুকাবিলা করতে থাকেন। এই সময় কয়েকজন হিন্দু জমিদারও শক্তি সঞ্চয় করে মুগলদের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। প্রকৃত পক্ষে রাজধানী তান্ডা ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলো ছাড়া সারা বাঙালাহ ছিলো মুগলদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

ফরিদপুর অঞ্চলে দুইজন আফগান (পাঠান) সরদার মজলিস দিলাওয়ার ও মজলিস কুত্‌ব নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। ঢাকা-মোমেনশাহী অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত ছিলো ঈসা খানের কর্তৃত্ব। নারায়ণগঞ্জের খিদিরপুর ছিলো তাঁর প্রধান কেন্দ্র। উড়িশা-বর্ধমান অঞ্চল ছিলো কুত্‌লু খানের নিয়ন্ত্রণে। খুলনা অঞ্চলে শ্রীধর মহারাজ বিক্রমাদিত্য উপাধি ধারণ করে স্বাধীন ভাবে শাসন চালাচ্ছিলেন। তাঁরই পুত্র ছিলেন প্রতাপাদিত্য। বরিশালের বৃহত্তর অংশে কর্তৃত্ব করেন কন্দর্প নারায়ণ। ভুলুয়া (উত্তর নোয়াখালী) অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন লক্ষণ মানিক্য। দক্ষিণাঞ্চল, দ্বীপগুলো ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে কখনো আরাকানের মগ, কখনো পর্তুগীজগণ কর্তৃত্ব করতে থাকে।

শুবাদার খান জাহান হুসাইন কুলী বেগ বিভিন্ন রণাংগনে যুদ্ধ করতে করতে অসুস্থ হয়ে পড়েন।

খৃষ্টীয় ১৫৭৮ সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।

৫৩. মুযাফফার খান তুরবাতি

খৃষ্টীয় ১৫৭৯ সনের এপ্রিল মাসে আগ্রার সুলতান আকবর মুযাফফার খান তুরবাতিকে শুবা বাঙালাহর শুবাদার করে তান্ডা পাঠান।

জালালুদ্দীন মুহাম্মাদ আকবর ছিলেন একজন বিভ্রান্ত ব্যক্তি। তিনি আল্লাহ প্রদত্ত দীন ইসলামকে পরিত্যাগ করে নিজেই এক আজগুবী ধর্মীয় মতবাদের প্রবর্তন করেন। তিনি এই মতবাদের নাম রাখেন দীন-ই-ইলাহী। এই মতবাদের কালেমা ছিলো- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আকবারু খালীফাতুল্লাহ। এই মতবাদের অনুসারীদেরকে বলা হতো চেলা। চেলাগণ তাদের পাগড়ীতে আকবরের ছবি ব্যবহার করতো। প্রতিদিন সকাল বেলা আকবরের দর্শন লাভকে পুণ্যের কাজ মনে করা হতো। সকলে প্রজাগণ রাজপ্রাসাদের সামনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াতো। আকবর তাদেরকে দর্শন

দেবার জন্য রাজকীয় পোষাক পরে প্রাসাদের ব্যালকনীতে এসে দাঁড়াতেন। এইটিকে বলা হতো ঝরোকা দর্শন। তাঁকে সকলে কুর্নিশ করতে হতো। রাজ-মহলে শিখা চিরন্তন জ্বালানো হয়। সারা দেশে গরু জবাই নিষিদ্ধ হয়। সুদ ও জুয়া বৈধ ঘোষিত হয়। মদ খাওয়া বৈধ করা হয়। নওরোজ উৎসবে দরবারে সাড়ম্বরে মদ পরিবেশন করা হতো। নতুন মতবাদ অনুযায়ী বাঘ ও সিংহের গোশত খাওয়া বৈধ করা হয়। মহিলাদের মতো পুরুষদের জন্য স্বর্ণালংকার ও রেশমী পোষাক পরা বৈধ করা হয়। মৃতদেহ পানিতে ভাসিয়ে দেয়া কিম্বা পুড়িয়ে ফেলা উত্তম গণ্য করা হয়। কেউ মৃতদেহ করবস্থ করতে চাইলে লাশের পা পশ্চিম দিকে রেখে কবরস্থ করতে বলা হয়।

আকবরের ইসলাম-বিরোধী কর্মকান্ড সজাগ ও নিষ্ঠাবান মুসলিমদেরকে দারুণভাবে বিক্ষুব্ধ করে। জৌনপুরের কাজী মোল্লা মুহাম্মাদ ইয়াযদী তাঁর বিরুদ্ধে ফতোয়া দেন। আকবরের নির্দেশে তাঁকে হত্যা করা হয়।

এতে সালতানাতে একটি অস্বস্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। বাঙালাহ ও বিহারে পরিস্থিতি ছিলো বিস্ফোরনুখ। বিদ্রোহী আফগান (পাঠান) সরদারগণ একত্রিত হয়ে শুবা বাঙালাহর রাজধানী তান্ডা আক্রমণ করেন।

খৃষ্টীয় ১৫৮০ সনের উনিশে এপ্রিল শুবাদার মুযাফফার খান তুরবাতি বন্দী হন। তাঁকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়।

৫৪. খান-ই-আযম

খৃষ্টীয় ১৫৮২ সনে আকবর খান-ই-আযমকে শুবা বাঙালাহর শুবাদার করে পাঠান। তিনি বিদ্রোহী আফগানদের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করেন ও কোন কোনটিতে সাফল্য অর্জন করেন। অতপর তিনি বাঙালাহ থেকে অন্যত্র বদলি হওয়ার আবেদন জানান। আকবর তাঁকে বিহারে বদলি করেন।

৫৫. শাহবাজ খান

খৃষ্টীয় ১৫৮৪ সনে খান-ই-আযমকে বদলি করে আকবর শাহবাজ খানকে শুবা বাঙালাহর শুবাদার নিযুক্ত করেন।

এই সময় ঈসা খান বৃহত্তর ঢাকা-মোমেনশাহী ও কুমিল্লা জিলার ওপর কর্তৃত্বশীল ছিলেন। কখনো তিনি অবস্থান করতেন খিদিরপুরে, কখনো মোমেনশাহী জিলার এগারসিন্ধুতে।

খৃষ্টীয় ১৫৮৪ সনে শুবাদার শাহবাজ খান পূর্ব বংগের দিকে অগ্রসর হন। এই সময় উড়িশা থেকে সরে আসা মাসুম খান কাবুলীকে নিয়ে ঈসা খান কুচবিহারে অবস্থান করছিলেন। শাহবাজ খান বিনা বাধায় খিদিরপুর ও সোনারগাঁও জয় করে শীতলক্ষা

নদী ধরে এগারসিন্ধুর দিকে এগিয়ে টুক নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেন। এখানে তিনি ঈসা খান ও মাসুম খান কাবুলীর প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। একদিন একটি মুগল বাহিনী বাজিতপুর এলে ঈসা খান তাদের ওপর ঝটিকা হামলা চালান। সেনাপতি তারসুন খান সহ বহু মুগল সৈন্য নিহত হয়। ঈসা খানের প্রবল আক্রমণের ফলে শাহবাজ খানও পিছু হটতে বাধ্য হন।

খৃষ্টীয় ১৫৮৪ সনের ত্রিশে সেপ্টেম্বর ভাওয়াল রণাংগনে মুগল বাহিনী দারুণভাবে পরাজিত হয়। শুবাদার শাহবাজ খান পালিয়ে তান্ডা চলে যান। মাসুম খান কাবুলী তাঁকে ধাওয়া করে বগুড়া পর্যন্ত পৌছেন। শাহবাজ খান তান্ডা ছেড়ে বিহারে চলে যান। শক্তি সঞ্চয় করে শাহবাজ খান ডিসেম্বর মাসে আবার তান্ডা আসেন।

খৃষ্টীয় ১৫৮৫ সনে মাসুম খান কাবুলী ফরিদপুরে সরে আসেন।

আকবর সাদিক খানকে বাঙালাহর ও শাহবাজ খানকে বিহারের কমান্ড প্রদান করেন। পরিস্থিতির কোন উন্নতি না হওয়ায় শাহবাজ খানকে পাঠান বাঙালায়।

শুবাদার শাহবাজ খান এবার তলোয়ারের পরিবর্তে বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করেন। তিনি ঈসা খানের সাথে সংলাপ শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষে একটি শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। শাহবাজ খান মাসুম খান কাবুলীর সাথেও চুক্তি করতে সক্ষম হন। তবে উভয় পক্ষই নিজ নিজ অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য যেই সময় প্রয়োজন তা পাওয়ার জন্যই এই চুক্তি স্বাক্ষর করে।

৫৬. সাঈদ খান

খৃষ্টীয় ১৫৮৭ সনে আকবর সাঈদ খানকে শুবা বাঙালাহর ও মানসিংহকে শুবা বিহারের শুবাদার নিযুক্ত করেন।

উড়িশার আফগান সরদার কুতলু খানের ইন্তিকালের পর তাঁর তরুণ পুত্র নাসির খান মসনদে বসেন। মানসিংহ উড়িশার উপর চাপ সৃষ্টি করেন।

খৃষ্টীয় ১৫৯০ সনে নাসির খান মুগলদের সাথে শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষর করেন। পরে আবার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। অবশেষে ১৫৯৩ সনে উড়িশা আগ্রা সালতানাতের অধীনে চলে যায়।

৫৭. মানসিংহ

খৃষ্টীয় ১৫৯৪ সনের মধ্যভাগে আকবর মানসিংহকে শুবা বাঙালাহর শুবাদার নিযুক্ত করেন।

মানসিংহ শুবা বাঙালাহর রাজধানী তান্ডা থেকে রাজমহলে স্থানান্তরিত করেন এবং এর নাম রাখেন আকবর নগর।

মানসিংহের প্রধান মাথাব্যথা হয়ে দাঁড়ায় পূর্ব বংগে কর্তৃত্বশীল ঈসা খানের শক্তি

খর্ব করণ। তিনি যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। ঈসা খানও বসে ছিলেন না। তিনি উড়িশা থেকে আগত উসমান খান ও সুলাইমান খানকে সাথে নিয়ে মুগলদের মুকাবিলার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকেন। যশোরের কেদার রায় বিক্রমপুরের নিকটে বসতি স্থাপন করে ঈসা খানের মিত্রে পরিণত হন।

মানসিংহের প্রেরিত বাহিনীর সাথে ঈসা খান বগুড়া, বিক্রমপুর প্রভৃতি রণাংগনে লড়েন। মুগল বাহিনী সবখানেই প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। উল্লেখ্য যে শুবাদার মানসিংহ কখনো নিজে ঢাকা আসেননি। ঈসা খানের সাথে তাঁর সরাসরি কোন লড়াই হয়নি।

খৃষ্টীয় ১৫৯৮ সনে মানসিংহ শুবা বাঙালাহ ছেড়ে চলে যান। আর ১৫৯৯ সনে পূর্ব বংগের স্বাধীনতার নিশান বরদার ঈসা খান ইন্তিকাল করেন।

ঈসা খানের ইন্তিকালের পর মুসা খান স্বাধীনতার পতাকা সমুন্নত রাখার সংকল্প নিয়ে মসনদে বসেন।

মানসিংহ আজমীরে বসে প্রতিনিধির মাধ্যমে বাঙালাহর শাসন তত্ত্বাবধান করছিলেন। কিন্তু ১৬০১ সনে তিনি আবার বাঙালায় আসেন। এবার অবশ্য তিনি ঢাকা পর্যন্ত পৌছেন। বিক্রমপুরের কেদার রায়কে নিজের দলে ভিড়াবার জন্য তিনি চেষ্টা চালান। কিন্তু কেদার রায় যেমন বিশ্বস্ত ছিলেন ঈসা খানের প্রতি, তেমনি বিশ্বস্ত থাকেন ঈসা খানের পুত্র মুসা খানের প্রতি।

খৃষ্টীয় ১৬০৫ সনের মার্চ মাসে মানসিংহ আগ্রা যান। আর ঐ বছরই অক্টোবর মাসে আকবর ইন্তিকাল করেন।

আগ্রার মসনদে বসেন নূরুদ্দীন মুহাম্মাদ জাহাঁগীর। নতুন সুলতান মানসিংহকে আবার বাঙালায় পাঠান। তবে এবার তিনি বাঙলায় থাকেন এক বছর।

৫৮. কুত্‌বুদ্দীন খান কোকা

খৃষ্টীয় ১৬০৬ সনে জাহাঁগীর কুত্‌বুদ্দীন খান কোকাকে শুবা বাঙালাহর শুবাদার নিযুক্ত করেন। বছর খানেক ছিলেন তিনি রাজমহলে। কিন্তু বাঙালাহ তাঁর নিকটও দুর্ভেদ্য প্রমাণিত হয়।

৫৯. জাহাঁগীর কুলী খান

খৃষ্টীয় ১৬০৭ সনে শুবা বাঙালাহর শুবাদার হিসেবে রাজমহলে আসেন জাহাঁগীর কুলী খান। তিনিও গোটা বাঙালায় আগ্রার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হন।

৬০. শায়খ আলাউদ্দীন ইসলাম খান চিশতি

খৃষ্টীয় ১৬০৮ সনে আগ্রার সুলতান জাহাঁগীর ইসলাম খান চিশতীকে শুবা বাঙালাহর শুবাদার করে রাজমহলে পাঠান। তখন তাঁর বয়স ৩৮ বছর।

ইসলাম খান ছিলেন খুবই বিচক্ষণ ও দৃঢ়চেতা লোক। সুপরিকল্পিতভাবে তিনি অগ্রসর হন। তিনি প্রথমে সসৈন্যে গৌড় পৌছেন। তাঁর প্রেরিত সৈন্যরা যুদ্ধ ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করলে তিনি আলাইপুর আসেন। সেখান থেকে সৈন্য পাঠিয়ে তিনি যশোর দখল করেন। তার পর তারা দখল করে পাবনা। এই দিকে বর্ষা মওসুম এসে যায়। ইসলাম খান রংপুরের ঘোড়াঘাটে অবস্থান গ্রহণ করেন। উত্তর-পূর্ব মোমেনশাহীর রাজা রঘুনাথ ঘোড়াঘাট এসে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। কুচবিহারের রাজা লক্ষী নারায়ণও একই পথ অবলম্বন করেন।

মুগল বাহিনী মানিকগঞ্জের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে মুসা খানের মিত্র বিনোদ রায়ের বিরুদ্ধে লড়তে এসে সুবিধা করতে পারেনি। ফরিদপুরের মজলিস কুতবের বিরুদ্ধেও মুগল সৈন্যরা সফলতা অর্জন করে। ফলে মুসা খান ও তাঁর মিত্রগণ ঢাকা-মোমেনশাহী অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েন।

বর্ষা মওসুম শেষ হলে ইসলাম খান সেনাপতি শায়খ কামালের নেতৃত্বে একদল সৈন্য পাঠান ঢাকার দিকে। আর তিনি নিজে নৌ-পথে মুসা খানের অন্যতম শক্ত ঘাঁটি যাত্রাপুরের দিকে অগ্রসর হন। ইসলাম খান কাটাসগড় এসে থামেন। মুসা খান যাত্রাপুর রক্ষার জন্য মির্যা মুমিন, দরিরা খান ও মধু রায়ের নেতৃত্বে অগ্র সেনা দল পাঠান। পরে তিনি নিজে নৌ-বহর নিয়ে অগ্রসর হন। পদ্মানদীর তীরে ডাকচরা নামক স্থানে এসে তিনি দ্রুত গতিতে মাটি দিয়ে একটি দুর্গ নির্মাণ করে ফেলেন।

এই অঞ্চলে উভয় দলে কয়েক দিন যাবত যুদ্ধ চলে। কোন পক্ষই জয় লাভ করতে পারেনি। ইতিমধ্যে ইসলাম খানের একদল সৈন্য ঢাকা থেকে ডাকচরার দিকে এগিয়ে আসে। উভয় দিক থেকে আক্রমণ চালিয়ে ইসলাম খান যাত্রাপুর দখল করে নেন। বাকি থাকে ডাকচরা। মুসা খান দেড় মাস পর্যন্ত মুগলদেরকে প্রতিহত করে চলেন। অতপর কুচবিহারের রাজা রঘুনাথ একটি শুকনো খালের ভেতর দিয়ে পথ দেখিয়ে মুগল সৈন্যদেরকে ডাকচরা দুর্গের নিকটে নিয়ে আসেন। মধ্যরাতে মুগলবাহিনী ডাকচরার ওপর হামলা চালায়। ঈসা খানের বহু সৈনিক প্রাণ হারায়। ঈসা খান নিজে পদ্মা নদীর অপর তীরে সরে যান।

শুবাদার ইসলাম খান সসৈন্যে ঢাকা পৌছেন। তিনি ঢাকার নাম রাখেন জাহাঁগীর নগর। মুসা খান খিদিরপুর ছেড়ে যান। সোনারগাঁওতে হাজী শামসুদ্দীন বাগদাদীকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করে মুসা খান শীতলক্ষা নদীর পূর্ব তীরে রণাংগন সাজান। মুসা খানের ভাই আবদুল্লাহ খানকে কদমরসূল, আরেক ভাই দাউদ খানকে কত্রাভূ এবং আরেক ভাই মাহমুদ খানকে ডেমরাতে প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়।

কিন্তু মুগল বাহিনীর প্রচন্ড আক্রমণের মুখে এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেংগে পড়ে। মুসা খান মেঘনা নদীর বুকে ইবরাহীমপুর নামক দ্বীপে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করেন।

মুগল বাহিনী সোনারগাঁও আক্রমণ করলে হাজী শামসুদ্দীন বাগদাদী আত্মসমর্পণ করেন।

খৃষ্টীয় ১৬১১ সনের এপ্রিল মাসে সোনারগাঁও মুগলদের পদানত হয়।

ইসলাম খান ভুলুয়ার (উত্তর নোয়াখালী) জমিদার অনন্ত মানিক্যের বিরুদ্ধে সেনাপতি শায়খ আবদুল ওয়াহিদের নেতৃত্বে একদল সৈন্য পাঠান। ডাকাতিয়া নদীর তীরে যুদ্ধ হয়। পরাজিত অনন্ত মানিক্য পালিয়ে প্রথমে ভুলুয়া ও পরে আরাকান চলে যান।

মূসা খান এবার ইসলাম খানের সাথে শান্তি আলোচনা শুরু করেন। খৃষ্টীয় ১৬১১ সনে তিনি জাহাঁগীরনগর এসে আগ্রার শুবাদার ইসলাম খানের নিকট আত্ম-সমর্পণ করেন।

খৃষ্টীয় ১৬১৩ সনে ইসলাম খান কামরূপের দিকে সামরিক অভিযান চালিয়ে রাজা পরীক্ষিত নারায়ণকে পরাজিত করে কামরূপ শুবা বাঙালাহর অন্তর্ভুক্ত করেন।

ইসলাম খান রাজমহল থেকে শুবা বাঙালাহর রাজধানী জাহাঁগীরনগর (ঢাকা) স্থানান্তরিত করেন। তিনি এখানে প্রাসাদ ও দুর্গ নির্মাণ করেন। এরপর প্রায় একশত বছর জাহাঁগীরনগর (ঢাকা) শুবা বাঙালাহর রাজধানী থাকে।

খৃষ্টীয় ১৬১৩ সনের একুশে আগাস্ট বাঙালাহর শুবাদার ইসলাম খান ইন্তিকাল করেন।

উল্লেখ্য যে আগ্রার সুলতান নূরুদ্দীন মুহাম্মাদ জাহাঁগীর শাসন কালের প্রথম ভাগে তাঁর পিতা আকবরের প্রবর্তিত ভ্রান্ত মতবাদ দীন-ই-ইলাহীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আকবরের শাসনকালের শেষ ভাগে শায়খ আহমাদ সরহিন্দি নির্ভেজাল ইসলামের নিশান বরদার হিসেবে আবির্ভূত হন। জাহাঁগীরের শাসন কালেও তিনি তাঁর আন্দোলন অব্যাহত রাখেন। তিনি ভালোভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে শাসক গোষ্ঠীকে ইসলামের পথে আনতে না পারলে মুসলিম উম্মাহকে সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচানো যাবে না। তাই তিনি শাহজাদা, রাজ-দরবারের আমীরগণ ও সেনাপতিদেরকে ইসলাম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়ার লক্ষ্যে দীর্ঘ চিঠি লিখতে থাকেন। তাঁদের নিকট তিনি মোট পাঁচশত চল্লিশটি চিঠি লিখেন। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানী যে তাঁর চিঠি দ্বারা শাহজাদা খুররম (পরবর্তীকালে শাহজাহান) ও বিশিষ্ট আমীরগণ প্রভাবিত হন। আবদুর রহীম খান খানান, মির্যা দারাব, কালিজ খান, নবাব আবদুল ওয়াহহাব, সাইয়েদ মাহমুদ, সাইয়েদ আহমাদ, খিদির খান লোদী, মির্যা বাদীউজ্জামান, জাব্বার খান, সিকান্দার খান লোদী প্রমুখ তাঁর চিঠি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

জাহাঁগীর একবার শায়খ আহমাদ সরহিন্দিকে বন্দীও করেন। কিন্তু চার দিকের অবস্থা আঁচ করে তিনি তাঁকে মুক্ত করে দেন। শাসনকালের শেষ দিকে জাহাঁগীর দীন-ই-ইলাহীর পৃষ্ঠপোষকতা পরিত্যাগ করেন।

আরো উল্লেখ্য যে, খৃষ্টীয় ১৬০৮ সনে ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমস ইংরেজদেরকে বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা দেয়ার অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠি সহ ক্যাপ্টেন হকিংস-কে সুলতান নূরুদ্দীন মুহাম্মাদ জাহাঁগীরের নিকট প্রেরণ করেন।

খৃষ্টীয় ১৬১৫ সনে রাজা প্রথম জেমস একই উদ্দেশ্যে টমাস রো-কে জাহাঁগীরের দরবারে পাঠান। টমাস রো ইংরেজ ব্যবসায়ীদের জন্য বেশ কিছু সুযোগ সুবিধা আদায় করতে সক্ষম হন।

৬১. কাসিম খান

খৃষ্টীয় ১৬১৩ সনের সেপ্টেম্বর মাসে নূরুদ্দীন মুহাম্মদ জাহাঁগীর ইসলাম খানের ভাই কাসিম খানকে শুবা বাঙালাহর শুবাদার নিযুক্ত করেন। কাসিম খান খৃষ্টীয় ১৬১৪ সনের মে মাসে জাহাঁগীরনগর (ঢাকা) আসেন।

মুগল-আফগান সংঘর্ষ চলাকালে আরাকানের রাজা মেঙ খামঙ চট্টগ্রামের ওপর তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর মগ সৈন্যরা বাঙালাহর উপকূল অঞ্চলে হামলা চালিয়ে লুণ্ঠন করতো। এই সময় কখনো কখনো পর্তুগীজদের সাথে তাদের সংঘর্ষ হতো। পর্তুগীজগণ তখন তাদের দলপতি গঞ্জালিসের নেতৃত্বে সন্দীপে খুঁটি গেড়ে বসেছিলো।

বাঙালাহ পুরোপুরি মুগলদের দখলে চলে যাওয়ায় আরাকানীজ ও পর্তুগীজ-উভয় পক্ষই শংকিত হয়ে উঠে এবং একে অপরের সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।

খৃষ্টীয় ১৬১৪ সনে এই দুই শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুগল শাসিত ভুলুয়া (উত্তর নোয়াখালী) আক্রমণ করে বসে। ভুলুয়াতে অবস্থানরত থানাদার আবদুল ওয়াহিদ ডাকাতিয়া নদী ও মাছুয়া খাল এলাকায় সরে আসেন।

এই সময় আরাকানীজ ও পর্তুগীজদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। পর্তুগীজগণ লুণ্ঠন কাজ করে সন্দীপ চলে যায়। আরাকানীজরা থেকে যায় ডাকাতিয়ার তীরে। থানাদার আবদুল ওয়াহিদ শক্তি সঞ্চয় করে ডাকাতিয়ার দক্ষিণ তীরে এসে আরাকানীজদের উপর হামলা চালান। পরাজিত হয়ে আরাকানের রাজা পালিয়ে যান।

কাসিম খানের শাসনকালে তিনবার আরাকানের দিকে ও দুইবার কাছাড়-আসামের দিকে সামরিক অভিযান পরিচালিত হয়।

খৃষ্টীয় ১৬১৭ সনে শুবাদার কাসিম খান বাঙালাহ ছেড়ে চলে যান।

৬২. ইবরাহীম খান

খৃষ্টীয় ১৬১৭ সনের নভেম্বর মাসে ইবরাহীম খান বাঙালাহর শুবাদার নিযুক্ত হয়ে জাহাঁগীর নগর (ঢাকা) আসেন।

ইসলাম খানের শাসনকাল থেকে মূসা খান রাজধানীতে নজরবন্দী অবস্থায় ছিলেন। খৃষ্টীয় ১৬১৮ সনে ইবরাহীম খান তাঁকে মুক্ত করে দেন। এর পর থেকে মূসা খান ইবরাহীম খানের সহযোগী হয়ে কাজ করতে থাকেন।

কামরূপ ফ্রন্টে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে ইবরাহীম খান চট্টগ্রামের দিকে নজর দেন। অবশ্য এর পূর্বে তিনি ত্রিপুরা নিয়ন্ত্রণে আনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে খৃষ্টীয় ১৬১৮ সনে ত্রিপুরা আক্রমণ করেন। মির্যা ইসফানদিয়ারের নেতৃত্বে একদল সৈন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়া হয়ে অগ্রসর হয়। আরেক দল সৈন্য মির্যা নূরুদ্দীন ও মূসা খানের নেতৃত্বে কুমিল্লা জিলার মিহিরকুল হয়ে ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুরের দিকে অগ্রসর হয়। তদুপরি গোমতী নদী হয়ে বাহাদুর খান সামনে এগুতে থাকেন। ত্রিপুরা রাজ যশোমানিক্য পরাজিত হয়ে আরাকানের দিকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু পথিমধ্যে বন্দী হন।

খৃষ্টীয় ১৬১৮ সনের নভেম্বর মাসে রাজধানী উদয়পুরে মুগল বাহিনী প্রবেশ করে। ত্রিপুরা রাজ্য শুবা বাঙালাহর অংশে পরিণত হয়।

খৃষ্টীয় ১৬২০ সনে আরাকানের রাজা পর্তুগীজদের ঘাঁটি সন্দীপ দখল করে নেন ও বাঙালাহর দক্ষিণাঞ্চলগুলোর ওপর লুণ্ঠন কাজ চালাতে থাকেন। তিনি তাঁর নৌ-সেনাদের নিয়ে ঢাকার কাছাকাছি বাঘার চর পর্যন্ত পৌছেন। ইবরাহীম খান মগদের বিরুদ্ধে অভিযানে নামেন। তাঁর সাহায্যে অগ্রসর হন মূসা খান। আরাকান বাহিনী পালিয়ে যায়।

খৃষ্টীয় ১৬২১ সনে আরাকানের মগেরা মেঘনার মোহনায় দক্ষিণ শাহবাজপুর দ্বীপ পর্যন্ত এগিয়ে আসে। ইবরাহীম খান অগ্রসর হলে তারা পালিয়ে যায়।

বার্মার রাজার সাথে আরাকানের রাজার শত্রুতা দেখা দিলে আরাকানের রাজা ঐদিকে মনোযোগী থাকেন। এই সুযোগে পর্তুগীজরা আবার বেপরোয়া হয়ে উঠে। তারা লুটতরাজ চালাতে চালাতে যশোর পর্যন্ত এসে পৌছে। ইবরাহীম খান সসৈন্যে এগিয়ে গেলে পর্তুগীজ-দস্যুরা দক্ষিণ দিকে সরে যায়।

খৃষ্টীয় ১৬২৩ সনে মূসা খান ও কামরূপের শাসনকর্তা শায়খ কামাল ইন্তিকাল করেন। তাঁরা উভয়ে ছিলেন সুযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব। মূসা খানের পুত্র মাসুম খান তখন উনিশ বছরের তরুণ। ইবরাহীম খান তাঁকেও মর্যাদার আসন দান করেন।

খৃষ্টীয় ১৬২৪ সনে বিদ্রোহী শাহজাদা খুররম রাজমহলের দিকে অগ্রসর হন। শুবাদার ইবরাহীম খান তাঁর মুকাবিলায় অগ্রসর হলে বিশে এপ্রিল উভয় বাহিনীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে ইবরাহীম খান নিহত হন।

শাহজাদা খুররম পাভুয়া, ঘোড়াঘাট ও পাবনা পদানত করে শুবা বাঙালাহর রাজধানী জাহাঁগীরনগর (ঢাকা) পৌছেন। কিন্তু তিনি মাত্র সাত দিন ঢাকাতে অবস্থান করে আবার উত্তর ভারতের দিকে চলে যান। সেনাপতি মহব্বত খান তাঁকে সুখে থাকতে দেননি। শাহজাদা খুররম উত্তর ভারতে পরাজিত হয়ে রাজমহলে এসে চব্বিশ দিন অপেক্ষা করে দাক্ষিণাত্যের দিকে চলে যান।

৬৩. মহব্বত খান

খৃষ্টীয় ১৬২৫ সনে নূরুদ্দীন মুহাম্মাদ জাহাঁগীর সেনাপতি মহব্বত খানকে শুবা বাঙালাহর শুবাদার নিযুক্ত করেন। এই নিযুক্তি ছিলো একটি চক্রান্তের ফসল। জাহাঁগীরের বেগম নূরজাহান মহব্বত খানকে পছন্দ করতেন না। কারণ শায়খ আহমাদ সরহিন্দির আন্দোলনের প্রতি তিনি ছিলেন সহানুভূতিশীল। অতএব তাঁকে রাজধানী থেকে দূরে সরিয়ে রাখাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করে সুদূর বাঙালাহর শুবাদার নিযুক্ত করা হয়।

মহব্বত খান বাঙালাহ আসেন। কিন্তু নূর জাহানের কিছু হঠকারী পদক্ষেপের কারণে তিনি বিক্ষুব্ধ হন।

খৃষ্টীয় ১৬২৬ সনে তিনি সসৈন্যে এগিয়ে গিয়ে সুলতান জাহাঁগীরকে আটক করেন। নূরজাহান পালাতে সক্ষম হন। তবে পরে আত্মসমর্পণ করে বন্দী জাহাঁগীরের সংগিনী হন।

কিন্তু অনুগত ব্যক্তিদের সাহায্যে জাহাঁগীর ও নূরজাহান নজরবন্দী অবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করেন। ফলে মহব্বত খান দ্রুততার সাথে দাক্ষিণাত্যে গিয়ে বিদ্রোহী শাহাজাদা খুররমের (শাহজাহান) সাথে মিলিত হন।

মহববত খানের অনুপস্থিতি কালে আরাকানের মগ বাহিনী বেপরোয়া হয়ে উঠে। তারা প্রথমে ভুলুয়া ও পরে জাহাঁগীরনগরে প্রবেশ করে ব্যাপক লুটতরাজ করে। জাহাঁগীরনগরের বহু ঘরবাড়ি তারা পুড়িয়ে দেয়। বহু বাসিন্দাকে বন্দী করে নিয়ে যায়।

৬৪. মুকাররাম খান

খৃষ্টীয় ১৬২৬ সনে জাহাঁগীর মুকাররাম খানকে শুবা বাঙালাহর শুবাদার করে পাঠান। কিন্তু ১৬২৭ সনে তিনি নৌকা ডুবিতে মারা যান।

৬৫. মির্যা হিদায়াতুল্লাহ ফিদাই খান

খৃষ্টীয় ১৬২৭ সনে সুলতান জাহাঁগীর ফিদাই খানকে শুবা বাঙালাহর শুবাদার নিযুক্ত করেন।

খৃষ্টীয় ১৬২৭ সনের অকটোবর মাসে জাহাঁগীর ইন্তিকাল করেন।

খৃষ্টীয় ১৬২৮ সনে শাহজাদা খুররম আবুল মুযাফফার শিহাবুদ্দীন মুহাম্মাদ শাহজাহান উপাধি ধারণ করে আগ্রার মসনদে বসেন।

উল্লেখ্য যে জাহাঁগীর-পত্নী নূর জাহান তাঁর জামাতা শাহরিয়ারকে আগ্রার মসনদে বসাতে চেয়েছিলেন। তিনি শাহজাদা খুররমকে অপছন্দ করতেন। খুররমের ওপর শায়খ আহমাদ সরহিন্দির প্রভাবই ছিলো এই অপছন্দের মূল কারণ।

শাহজাহান মসনদে বসে নূরজাহানের সাথে মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করেন এবং তাঁর জন্য সম্মানজনক ভাতা নির্ধারণ করেন।

৬৬. কাসিম খান

খৃষ্টীয় ১৬২৮ সনে শাহজাহান কাসিম খানকে শুবা বাঙালাহ্র শুবাদার করে পাঠান। শুবাদার ইসলাম খানের সময় কাসিম খান জাহাঙ্গীরনগরে (ঢাকা) খাজাঞ্চী হিসেবে কাজ করেছিলেন। পরে তিনি আগ্রার শাসনকর্তা হন।

উল্লেখ্য যে ১৬২১ থেকে ১৬২৪ সনের মধ্যে পর্তুগীজগণ বাঙালাহ্র বিভিন্ন অঞ্চলে হামলা চালিয়ে ৪২ হাজার লোককে ধরে নিয়ে যায়। এদের মধ্যে চাপ সৃষ্টি করে তারা ২৮ হাজার লোককে খৃষ্টান বানায়। বাকিদেরকে দাস বানায়।

আগ্রার মসনদে বসার পর শাহজাহান তাঁর প্রজাদের লুণ্ঠিত জাহাজগুলো ফিরিয়ে দেয়ার জন্য গোয়াতে অবস্থানরত পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষের নিকট চিঠি পাঠান। কিন্তু ফলোদয় হয়নি।

খৃষ্টীয় ১৬৩২ সনে শুবাদার কাসিম খান পর্তুগীজদের হুগলী ঘাঁটি আক্রমণ করেন। অবরোধ তিন মাস স্থায়ী হয়। অবশেষে পর্তুগীজগণ নদীপথে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। তাদের বহু নৌকা ডুবিয়ে দেয়া হয়। হুগলী দখল করে মুগল বাহিনী পর্তুগীজ ঘাঁটি থেকে দশ হাজার বন্দীকে উদ্ধার করে। পর্তুগীজগণ এদেরকে দাস হিসেবে আটক রেখেছিলো।

হুগলী দখলের কিছুকাল পর শুবাদার কাসিম খান ইন্তিকাল করেন।

৬৭. আযম খান

খৃষ্টীয় ১৬৩২ সনে আগ্রার সুলতান শাহজাহান মীর মুহাম্মদ বাকির আযম খানকে শুবা বাঙালাহর শুবাদার নিযুক্ত করেন।

খৃষ্টীয় ১৬৩৩ সনে উড়িশার বালাসোরে ইংরেজদের প্রথম বাণিজ্য কুটি স্থাপিত হয়।

উল্লেখ্য যে খৃষ্টীয় ১৬৩৫ মনে সুলতান শাহজাহান আগ্রা থেকে দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

৬৮. ইসলাম খান মাশহাদী

খৃষ্টীয় ১৬৩৫ সনে ইসলাম খান মাশহাদী শুবা বাঙালাহর শুবাদার নিযুক্ত হন।

খৃষ্টীয় ১৬৩৭ সনে অহোম (মূল আসাম) রাজের উস্কানীতে বলি নারায়ণ কামরূপে মুগল শাসনের কেন্দ্র হাজো-র উপর আক্রমণ চালিয়ে তা দখল করেন। ইসলাম খান মাশহাদী তাঁর বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। কয়েক দিন যাবত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। অবশেষে পরাজিত হয়ে বলি নারায়ণ আসামের গভীর অরণ্যে পালিয়ে যান। মুসলিম বাহিনী হাজো উদ্ধার করে। দাররাং শুবা বাঙালাহর অন্তর্ভুক্ত হয়। খৃষ্টীয় ১৬৩৯ সনে অহোম রাজের সংগে মুসলিম শাসনকর্তার শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী উত্তরাঞ্চলে বারনাদি নদী ও দক্ষিণাঞ্চলে আসুর আলী নদী অহোম রাজ্য ও শুবা বাঙালাহর সীমান্ত বলে স্বীকৃত হয়। ঐ অঞ্চলে মুসলিম শাসিত অংশের প্রশাসনিক কেন্দ্র স্থাপিত হয় গৌয়াহাটিতে।

৬৯. শাহজাদা মুহাম্মাদ শুজা

খৃষ্টীয় ১৬৩৯ সনে দিল্লীর সুলতান শাহজাহান ইসলাম খান মাশহাদীকে দিল্লী ডেকে নেন এবং শাহাজাদা মুহাম্মাদ শুজাকে শুবা বাঙালাহর শুবাদার নিযুক্ত করেন।

মুহাম্মাদ শুজা জাহাঁগীরনগর (ঢাকা) থেকে রাজধানী রাজমহলে স্থানান্তর করেন।

রাজমহলে অবস্থান করার কারণে শুবাদারের পক্ষে পর্তুগীজ, ডাচ (নেদারল্যাণ্ডের অধিবাসী) ও ইংলিস ব্যবসায়ীদের ওপর নজরদারী করা সহজ হয়। কেননা তারা হুগলী হয়ে নদীপথে রাজমহল, মাখসুসাবাদ (মুর্শিদাবাদ) ও পাটনা পর্যন্ত তাদের মালামাল আনা নেওয়া করতো।

খৃষ্টীয় ১৬৪২ সনে উশিড়াকেও শুবা বাঙালাহর সাথে যুক্ত করে দেয়া হয়।

পর্তুগীজদেরকে হুগলীতে এসে শান্তিপূর্ণভাবে বাণিজ্য করার অনুমতি দেয়া হয়।

খৃষ্টীয় ১৬৫০ সনে দি ইংলিস ইস্ট-ইণ্ডিয়া কম্পেনী দিল্লীর সুলতান শাহাজাহান থেকে পণ্য পরিবহনে বেশ কিছু সুবিধা সম্বলিত একটি ফরমান লাভ করে।

খৃষ্টীয় ১৬৫১ সনে ইংরেজগণ হুগলীতে তাদের ফ্যাক্টরী স্থাপন করে।

খৃষ্টীয় ১৬৫৭ সনে শাহজাহান অসুস্থ হয়ে পড়লে শাহজাদাদের মধ্যে বিরোধ বাধে।

খৃষ্টীয় ১৬৫৮ সনে মুহীউদ্দীন মুহাম্মাদ আওরঙ্গজেব আলমগীর বিজয়ী বেশে দিল্লী প্রবেশ করেন। মুহাম্মাদ শুজাও আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে লড়েন।

৭০. মুয়াযযাম খান মীর জুমলা

খৃষ্টীয় ১৬৫৯ সনে আওরঙ্গজেব মীর জুমলাকে শুবা বাঙালাহর শুবাদার নিযুক্ত করেন।

মীর জুমলা এগিয়ে এলে মুহাম্মাদ শুজা রাজমহল ছেড়ে প্রথমে তাণ্ডা ও পরে জাহাঁগীর নগর (ঢাকা) চলে আসেন। পরে তিনি আরাকানে গিয়ে সেখানকার রাজার নিকট রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেন।

আরাকানের রাজা মুহাম্মাদ শুজার ধন-সম্পদ হস্তগত করা ও তাঁর কন্যাকে বিয়ে করার চক্রান্তে মেতে উঠেন। শুজা তাঁর অবস্থান স্থল থেকে গোপনে সরে পড়ে বার্মার দিকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেন। টের পেয়ে আরাকান রাজ তাঁর পিছু নেন ও সপরিবারে শাহজাদা শুজাকে হত্যা করেন।

শুবাদার মীর জুমলা খুবই সাহসী, কর্মঠ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি শুবা বাঙালাহর রাজধানী রাজমহল থেকে আবার জাহাঁগীর নগর (ঢাকা) স্থানান্তরিত করেন। তিনি ইদরাকপুর (মুনশীগঞ্জ), ফতুল্লা ও বুড়িগংগার অপর তীরে আরেকটি দুর্গ নির্মাণ করেন। খিদিরপুর, সোনাকান্দা প্রভৃতি দুর্গ মজবুত করেন। ডাচ বণিকগণ যথারীতি শুল্ক পরিশোধ করে নির্বিঘ্নে শুবা বাঙালাহতে বাণিজ্য চালিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু ইংরেজ বণিকগণ তাদের শুল্ক আদায়ে টালবাহানা করতে তাকে। ফলে শুবাদার মীর জুমলা ইংরেজদের কাসিমবাজার ফ্যাকটরি বন্ধ করে দেন। পরে তারা বার্ষিক তিন হাজার টাকা কর দেবার অংগীকার করে আবার ব্যবসা চালাতে থাকে।

খৃষ্টীয় ১৬৬১ সনে মীর জুমলা কুচবিহারে সামরিক অভিযান চালাতে বাধ্য হন। তিনি কুচবিহারের রাজধানী জয় করে মুহাম্মাদ সালিহকে রাজপ্রাসাদের ছাদে উঠে আযান দিতে বলেন। চার দিকে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ে। কুচবিহারের পলাতক রাজা ভীম নারায়ণের পুত্র বিশ্বনারায়ণ গোপনে মীর জুমলার নিকট পৌঁছে ইসলাম গ্রহণ করেন। কুচ বিহারের রাজধানীর নামও ছিলো কুচ বিহার। এবার এর নাম রাখা হয় আলমগীর নগর। খৃষ্টীয় ১৬৬২ সনে শুবাদার মীর জুমলা সসৈন্যে অগ্রসর হয়ে গৌয়াহাটি ও কাজলি পুনর্দখল করেন। এরপর তিনি অহোম বা মূল আসামের দিকে অগ্রসর হন।

খৃষ্টীয় ১৬৬২ সনের ১৭ই মার্চ অহোম রাজ্যের রাজধানী গরহগাঁও তাঁর পদানত হয়। অহোম রাজ তাঁর রাজ্যের একেবারে পূর্ব প্রান্তস্থিত নামরূপ নামক স্থানে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করেন।

মীর জুমলা ছিলেন নাছোড়বান্দা। দিহিং নদী পেরিয়ে তিনি নামরূপের দিকে অগ্রসর হন। ইতিমধ্যে তিনি জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু জিহাদী প্রেরণা তাঁকে পিছু হঠতে দেয়নি। তিনি নামরূপের নিকটে পৌঁছেন। অহোম-রাজ শান্তি চুক্তির জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানাতে থাকেন। অবশেষে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

গৌয়াহাটি, কাজলি প্রভৃতি স্থানে গিয়ে মীর জুমলা প্রশাসনিক ব্যবস্থা দৃঢ় করে

নৌ-পথে রাজধানীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।

খৃষ্টীয় ১৬৬৩ সনের ৩০শে মার্চ খিদিরপুর থেকে কিছু দূরে থাকতেই তিনি ইন্তিকাল করেন। উল্লেখ্য যে অহোম রাজ শান্তি চুক্তির অন্যতম শর্ত হিসেবে তাঁর এক কন্যাকে মীর জুমলার তত্ত্বাবধানে প্রেরণ করেন। রাজকুমারী ইসলামী জীবন দর্শন ও মুসলিমদের চারিত্রিক সৌন্দর্য দেখে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর নাম রাখা হয় রহমত বানু। দিল্লীর অন্যতম শাহজাদা মুহাম্মাদ আযমের সাথে রহমত বানুর বিয়ে হয়।

৭১. দাউদ খান

খৃষ্টীয় ১৬৬৩ সনের সেপ্টেম্বর মাসে দাউদ খান শুবা বাঙালাহর ভারপ্রাপ্ত শুবাদার নিযুক্ত হন।

৭২. শায়েস্তা খান

খৃষ্টীয় ১৬৬৪ সনের মার্চ মাসে দিল্লীর সুলতান আওরঙ্গজেব শায়েস্তাখানকে শুবা বাঙালাহর শুবাদার নিযুক্ত করেন।

উল্লেখ্য যে আওরঙ্গজেব ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম। শায়খ আহমাদ সরহিন্দির চিন্তাধারা দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত ছিলেন। তিনি ইসলামের নির্ভেজাল রূপের সাথে পরিচিত ছিলেন। সারা ভারতে ইসলামী মূল্যবোধ উজ্জীবনে তিনি ছিলেন সদা তৎপর। বিভিন্ন শুবাতে তিনি নেক ব্যক্তিদেরকে শুবাদার করে পাঠান।

খৃষ্টীয় ১৬৬৪ সনের ১৩ই ডিসেম্বর শুবাদার শায়েস্তা খান জাহাঁগীর নগর (ঢাকা) এসে পৌঁছেন। প্রথমেই তিনি যাকাত, উশর, আয়মা, জাগীর ইত্যাদি সংক্রান্ত অসংগতি দূর করেন।

তিনি প্রতিদিন খোলাখুলি দরবারে বসতেন। লোকেরা সরাসরি তাঁর নিকট তাদের অভিযোগ পেশ করতো। তিনি সেইগুলোর মীমাংসা করতেন। জনগণের কাছ থেকে যাতে নির্ধারিত হারের চেয়ে বেশি রাজস্ব আদায় করা না হয় সেই দিকে তিনি কড়া নজর রাখতেন।

আলাউদ্দিন হুসাইন শাহের শাসনকালে চট্টগ্রাম বাঙালাহ সালতানাতের অধীনে আসে। পরবর্তীকালে মুগল-আফগান দ্বন্দ্বের সময় আরাকানের রাজা চট্টগ্রাম দখল করে নেন। তখন থেকে চট্টগ্রাম মগ ও পর্তুগীজদের লুণ্ঠন ভূমিতে পরিণত হয়।

মীর জুমলা অহোম-রাজ্য জয়ের পর চট্টগ্রাম অভিযানে যাবেন বলে পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সময় তিনি পাননি।

হুগলী থেকে বিতাড়িত পর্তুগীজ দস্যুরা আরাকান রাজের পৃষ্ঠপোষকতায় চট্টগ্রামে অবস্থান করতে থাকে। তারা শুবা বাঙালাহর বিভিন্নস্থানে লুণ্ঠন চালিয়ে যেই সম্পদ

লাভ করতো তার অর্ধাংশ আরাকান রাজকে দিতো।

শায়েস্তা খান সাঈদ নামক এক আফগান সরদারকে ভুলুয়াতে মোতায়েন করেন। চাঁদপুরের নিকটে অবস্থিত সংগ্রামগড়ে পাঠান মুহাম্মাদ শরীফকে। চাঁদপুরের নিকটে শ্রীপুরে পাঠান আবুল হাসানকে। ধাপা নামক স্থানে নিযুক্ত হন মুহাম্মাদ বেগ আবাকাস। আর চট্টগ্রামে নৌ-হামলা চালাবার জন্য তৈরি করেন তিনশত রণ-তরী।

এই সময়টিতে দলত্যাগী এককালের মুগল অফিসার দিলাওয়ার খানের নিয়ন্ত্রণে ছিলো সন্দীপ। শায়েস্তাখান আবুল হাসানের নেতৃত্বে একটি নৌ-বহর সন্দীপের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। খৃষ্টীয় ১৬৬৫ সনের ১২ই নভেম্বর আবুল হাসান সন্দীপ দখল করেন।

মুগল বাহিনীর সাথে পেরে উঠা যাবেনা ভেবে পর্তুগীজগণ আরাকান-রাজের পক্ষত্যাগ করে ভুলুয়াতে এসে মুগল বাহিনীর পক্ষ অবলম্বন করার অংগীকার ব্যক্ত করে।

এরপর স্থল-পথ ও নৌ-পথে চট্টগ্রামের দিকে অভিযান পরিচালিত হয়। শায়েস্তাখানের পুত্র বুযুরগ উমেদ খান ছিলেন এই অভিযানের প্রধান সেনাপতি। ফরহাদ খান, মুনাওয়ার খান, মীর মুরতাদা, মুহাম্মাদ বেগ আবাকাস প্রমুখ সহকারী সেনাপতি হিসেবে কর্তব্য পালন করেন। বিভিন্ন রণাংগনে মগ বাহিনী পরাজিত হতে থাকে।

খৃষ্টীয় ১৬৬৬ সনের ২৭শে জানুয়ারী বুযুরগ উমেদ খান চট্টগ্রাম প্রবেশ করেন। তাঁর অন্যতম সহকর্মী মীর মুরতাদা মগদেরকে তাড়িয়ে দক্ষিণে রামু পর্যন্ত পৌঁছেন।

চট্টগ্রাম বিজয়ের খবর দিল্লীতে পৌঁছলে আওরঙ্গজেব এর নাম রাখেন ইসলামাবাদ।

চট্টগ্রাম জয়ের পর দি ইংলিস ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পেনী ঢাকাতে একটি বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। তারা শুবা বাঙালাহ থেকে মসলিন কাপড় সহ বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য ইউরোপের বাজারে সরবরাহ করতো। শুল্ক প্রদানে অনীহা ও কম্পেনীর কর্মকর্তাগণ কর্তৃক অবৈধ প্রাইভেট ব্যবসা পরিচালনার কারণে ইংরেজদের সাথে সরকারের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠে। উভয় পক্ষে আলাপ আলোচনার পর স্থির হয় যে দি ইংলিস ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পেনী বছরে তিন হাজার টাকা কর দেবে, আর কোন শুল্ক দেবে না।

শুবাদার মীর জুমলার শাসনকাল থেকে থমাস প্র্যাট ইংরেজদের পক্ষ থেকে সরকারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। শুবাদার শায়েস্তা খান তাঁকে তিন শত সৈন্যের মনসবদার নিযুক্ত করেন। কিন্তু থমাস প্র্যাট হঠাৎ একদিন কয়েকজন

ইংরেজ ও কয়েকজন পর্তুগীজ সহ শুবাদারের পক্ষ ত্যাগ করে তাঁর বহু জাহাজের ক্ষতি করে ও দুইটি জাহাজ নিয়ে পালিয়ে আরাকান রাজের দলে ভিড়েন। শায়েস্তা খান ইংরেজ কর্মকর্তাদের নিকট মিঃ প্র্যাটকে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দেন। তা না হলে তিনি বাঙালায় তাদের ব্যবসা বন্ধ করে দেবেন বলে জানানা। ইংরেজ কর্মকর্তাগণ অপারগতা প্রকাশ করে। অবশ্য মিঃ প্র্যাট কোন কারণে আরাকান রাজ কর্তৃক নিহত হন। ইতিমধ্যে দিল্লীর সুলতান আওরঙ্গজেব সকল ইউরোপীয় কম্পেনীর কাছ থেকে শতকরা দুইভাগ হারে শুল্ক আদায়ের নির্দেশ জারি করেন।

খৃষ্টীয় ১৬৭৭ সনে আওরঙ্গজেব শায়েস্তা খানকে দিল্লীতে ডেকে পাঠান।

৭৩. ফিদাই খান (আযম খান)

খৃষ্টীয় ১৬৭৮ সনের জানুয়ারী মাসে শুবা বাঙালাহর শুবাদার হয়ে আসেন ফিদাই খান। চার মাস পর তিনি ইন্তিকাল করেন।

৭৪. শাহজাদা সুলতান মুহাম্মাদ আযম

খৃষ্টীয় ১৬৭৮ সনের মধ্যভাগে আওরঙজেব তাঁর তৃতীয় পুত্র সুলতান মুহাম্মাদ আযমকে শুবা বাঙালাহর শুবাদার করে পাঠান।

তিনি জাহাঁগীরনগর এসে ইউরোপীয় কম্পেনীগুলোর কাছ থেকে শতকরা দুইভাগ হারে শুল্ক আদায় সম্পর্কিত কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ কার্যকর করার উদ্যোগ নেন। এই দিকে ইংরেজগণ পাটনাতে অবস্থিত তাদের অফিসার জব চার্ণককে নির্দেশ দেয় দিল্লীর সুলতানের কাছ থেকে তাদের অনুকূলে নতুন একটি ফরমান হাছিল করতে।

৭৫. শায়েস্তা খান

খৃষ্টীয় ১৬৭৯ সনের শেষের দিকে আওরঙজেব শাহজাদা সুলতান মুহাম্মাদ আযমকে দিল্লীতে ডেকে নেন এবং শায়েস্তা খানকে আবার বাঙালাহর শুবাদার করে পাঠান।

দিল্লীর সুলতানের কাছ থেকে নতুন ফরমান হাছিলের চেষ্টা চলছে এই বাহানায় ইংরেজগণ ১৬৭৭ সন থেকেই তাদের বার্ষিক প্রদেয় তিন হাজার টাকা পরিশোধ করা থেকে বিরত থাকে।

খৃষ্টীয় ১৬৮২ সনে দি ইংলিস ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পেনীর গভর্ণর হিসেবে হুগলীতে আসেন উইলিয়াম হেজেস। তাঁর বাসা পাহারা দেওয়ার বাহানায় একজন কর্পোরালের অধীনে বিশজন ইংরেজ সৈন্য এসে হুগলীতে অবস্থান গ্রহণ করে। এইটি ছিলো শুবা বাঙালাহতে ইংরেজদের প্রথম সামরিক স্থাপনা।

খৃষ্টীয় ১৬৮৪ সনের আগস্ট মাসে Gyfford হুগলীতে আসেন উইলিয়াম হেজেস-এর স্থলাভিষিক্ত হয়ে। ইংরেজগণ কোন শুল্কই দিচ্ছিলো না।

খৃষ্টীয় ১৬৮৬ সনে দি ইংলিস ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পেনী ইংল্যাণ্ডের রাজা দ্বিতীয় জেমসের কাছ থেকে প্রয়োজনে বিদেশের স্থানীয় সরকারের সাথে যুদ্ধ করার অনুমতি হাছিল করে। এর পর কম্পেনী ভাইস এডমিরাল নিকলসনের কমাণ্ডে দশটি যুদ্ধ জাহাজে করে ছয় শত সৈন্য প্রেরণ করে। মাদ্রাজ কাউন্সিলকে নির্দেশ দেয়া হয় তারা যেনো আরো চার শত সৈন্য নিকলসনের কমাণ্ডে দেয়। কম্পেনীর হেড কোয়ার্টারস ভাইস-এডমিরাল নিকলসনকে প্রথমে বালাসোরে যেতে ও সেখান থেকে চট্টগ্রামে গিয়ে তা দখল করে সেখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করতে বলে নির্দেশ ছিলো, অতপর নিকলসন চট্টগ্রাম থেকে জাহাঁগীর নগরের (ঢাকা) দিকে অগ্রসর হবেন ও শায়েস্তা খানকে তাঁদের পছন্দনীয় শর্তে সন্ধি করতে বাধ্য করবেন।

কম্পেনীর পক্ষ থেকে তাঁকে আরাকানের রাজা ও বাঙালাহর হিন্দু জমিদারদের সাথে মৈত্রী স্থাপনেরও পরামর্শ দেয়া হয়।

খৃষ্টীয় ১৬৮৬ সনের অক্টোবর মাসে এডমিরাল নিকলসন খারাপ আবহাওয়ার কারণে বালাসোর কিংবা চট্টগ্রাম না গিয়ে এলেন হুগলী।

২৮শে অক্টোবর হুগলীতে যুদ্ধ সংঘটিত হয় ইংরেজ ও বাঙালাহর সৈন্যদের মধ্যে। হুগলীর ফৌজদার আবদুল গনি পরাজিত হয়ে পিছু হটেন। নিকলসনের সৈন্যরা হুগলী শহরের ওপর গোলা বর্ষণ করে প্রায় পাঁচশত ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত করে। খবর পেয়ে শায়েস্তা খান বাঙালাহর অন্যান্য স্থানে অবস্থিত ইংরেজ কুঠিগুলি দখল করে নেন। তিনি হুগলীর দিকেও সৈন্য প্রেরণ করেন। শায়েস্তা খানের প্রেরিত সৈন্যরা হুগলী পৌঁছার আগেই ইংরেজগণ মাল-সামান গুটিয়ে সূতানটি নামক স্থানে সরে যায়। সেখান থেকে জব চার্ণক সংলাপ শুরু করেন। সংলাপ ব্যর্থ হওয়ায় ইংরেজ বাহিনী ১৬৮৭ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে সূতানটি ছেড়ে আরো দক্ষিণে সরে গিয়ে থানা ও হিজলী দখল করে সেখানে অবস্থান করতে থাকে। মে মাসের মাঝামাঝি সেনাপতি আবদুস সামাদ ১২ হাজার সৈন্য নিয়ে হিজলী পৌঁছেন। যুদ্ধে ইংরেজগণ পরাজিত হয়ে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য আগ্রহী হয়।

খৃষ্টীয় ১৬৮৭ সনের ১৬ই অগাস্ট শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইংরেজগণ সূতানটি ফিরে আসার অনুমতি পায়। ইতিমধ্যে দি ইংলিস ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পেনী জব চার্ণকের স্থলে ক্যাপ্টিন হীথকে বাঙালায় তাদের গভর্ণর নিযুক্ত করে পাঠায়। তিনি কয়েকটি যুদ্ধ জাহাজ ও ১৬০ জন সৈন্য নিয়ে বাঙালাহর দিকে অগ্রসর হন।

খৃষ্টীয় ১৬৮৮ সনের শেষভাগে তিনি বাঙালাহতে এসে পৌঁছেন। তবে ঐ বছরের জুন মাসেই শুবাদার শায়েস্তা খান বাঙালাহ থেকে চলে যান।

৭৬. খান-ই-জাহান বাহাদুর

খৃষ্টীয় ১৬৮৮ সনের শেষের দিকে খান-ই-জাহান বাহাদুর শুবা বাঙালাহর শুবাদার হিসেবে জাহাঁগীরনগর (ঢাকা) আসেন।

তাঁর শাসনকালে দি ইংলিস ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পেনীর গভর্ণর ক্যাপ্টিন হীথ সসৈন্যে উড়িশার উপকূলবর্তী বালাসোর আক্রমণ করে মুগল ফৌজদারকে পরাজিত করে তা দখল করেন। ক্যাপ্টিন হীথের সৈন্যগণ একমাসব্যাপী শহরবাসীদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালায়। ২৩শে ডিসেম্বর ইংরেজ বাহিনী সমুদ্র পথে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। সেখানে পৌঁছে তিনি টের পান যে চট্টগ্রাম দখল করা সহজ নয়। বেশ কিছুদিন নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে খৃষ্টীয় ১৬৮৯ সনের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তিনি মাদ্রাজের উদ্দেশ্যে সমুদ্র পাড়ি দেন।

পূর্বাঞ্চলে ইংরেজদের চট্টগ্রাম দখলের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তেমনি ব্যর্থ হয় ভারতের পশ্চিম উপকূলে তাদের কর্তৃত্ব স্থাপনের প্রয়াস। দি ইংলিস ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পেনী বুঝতে পারলো যে মুগলরা এখানো এতোখানি দুর্বল হয়নি যে তাদের হাত থেকে দেশের কিছু অংশ খসিয়ে নেয়া যায়। তাই তারা শান্তি স্থাপন করে বেশি বেশি বাণিজ্যিক মুনাফা হাছিলকে প্রাধান্য দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

আওরঙজেব বালাসোরে ইংরেজদের বর্বরতার খবর পেয়ে তাদের প্রতি কঠোর মনোভংগি গ্রহণ করেন। কম্পেনী দেড় লাখ টাকা জরিমানা দিয়ে বিনীতভাবে ব্যবসা চালিয়ে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করে। অবশেষে খৃষ্টীয় ১৬৯০ সনে সমঝোতা হয়।

৭৭. ইবরাহীম খান

খৃষ্টীয় ১৬৮৯ সনের জুলাই মাসে খান-ই-জাহানের স্থলে বাঙালাহর শুবাদার হয়ে আসেন ইবরাহীম খান।

জাহাঁগীরনগর এসে তিনি যুদ্ধজনিত কারণে বন্দী ইংরেজদেরকে মুক্তি দেন। জব চার্নক তখন মাদ্রাজে ছিলেন। নতুন শুবাদার তাঁকে বাঙালায় এসে ব্যবসা চালাতে বলেন।

খৃষ্টীয় ১৬৯০ সনের ২৪শে আগস্ট জব চার্নক সূতানটি ফিরে আসেন।

খৃষ্টীয় ১৬৯১ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে বার্ষিক তিন হাজার টাকা কর প্রদানের শর্তে ইংরেজদেরকে বাঙালাহর ব্যবসা–বাণিজ্য চালাবার অনুমতি দেয়া হয়।

ইংরেজগণ অনুভব করে যে হুগলীর চেয়ে সূতানটি তাদের জন্য বেশি সুবিধাজনক স্থান। তাই তারা সেখানে তাদের শক্তিশালী বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে তোলে।

খৃষ্টীয় ১৬৯০ সনে ইবরাহীম খানের অনুমতি নিয়ে ফ্রেঞ্চ (ফ্রান্সের অধিবাসী) বণিকগণ হুগলী থেকে চার মাইল দক্ষিণে অবস্থিত চান্দেরনগরে তাদের বাণিজ্য কুঠি গড়ে তোলে। আর খৃষ্টীয় ১৬৯৩ সনে দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিলে এককালীন চল্লিশ হাজার টাকা প্রদান করে ফ্রেঞ্চগণ বাঙালাহ, বিহার, উড়িশায় কাষ্টমস শুল্ক প্রদানের শর্তে ব্যবসা করার অনুমতি লাভ করে।

ইতিমধ্যে ডাচগণ (নেদারল্যাণ্ডসের অধিবাসী) হুগলীর নিকটবর্তী চিন সূরাহতে তাদের বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে তোলে। শুবাদার ইবরাহীম খানের শাসনকালে উড়িশায় রহীম খান ও বর্ধমানে শোভা সিংহ মুগলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ঐ অঞ্চলের মুগল ফৌজদারগণ বিদ্রোহীদেরকে দমন করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হন। এই বাহানায় ইউরোপীয় বণিকগণ তাদের বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোকে নিরাপদ রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলার অনুমতি দিতে শুবাদার ইবরাহীম খানকে অনুরোধ জানায়। শুবাদার তাদেরকে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেন। এতোটুকু অনুমতির ভিত্তিতে ইংরেজগণ কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম, ফ্রেঞ্চগণ চান্দের নগরে ফোর্ট অরলিন্‌স ও ডাচগন চিনসূরাহতে ফোর্ট গুস্তাভাস নামে দুর্গ গড়ে তোলে। এইগুলো ছিলো বাঙালাহর মাটিতে ইউরোপীয়দের সামরিক স্থাপনা।

৭৮. আযীমুদ্দীন

খৃষ্টীয় ১৬৯৭ সনে আওরঙজেব তাঁর নাতি আযীমুদ্দীনকে বাঙালাহর শুবাদার নিযুক্ত করেন।

আযীমুদ্দীনের সেনাপতি হামিদ খান কোরেশী উড়িশার বিদ্রোহী রহীম খানকে পরাজিত করেন। আযীমুদ্দীনের মাঝে-সম্পদ মওজুদ করার তীব্র বাসনা ছিলো। আর ইংরেজগণ তা টের পেয়েছিলো।

খৃষ্টীয় ১৬৯৮ সনের জুলাই মাসে ইংরেজগণ আযীমুদ্দীনকে ১৬ হাজার টাকা উপহার দিয়ে সূতানাটি, কলকাতা ও গোবিন্দপুর নামক তিনটি গ্রাম ক্রয়ের অনুমতি হাছিল করে।

আযীমুদ্দীনের শাসনকালে শুবা বাঙলাহর রাজস্ব ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। এই জন্য আওরঙজেব হায়দরাবাদে নিযুক্ত সৎ ও যোগ্য দিওয়ান কারতালাব খানকে (মুর্শিদকুলী খান) বাঙালাহর দিওয়ান নিযুক্ত করেন।

খৃষ্টীয় ১৭০২ সনে উড়িশার শুবাদার আসকার খান ইন্তিকাল করলে আওরঙজেব উড়িশাকে শুবা বাঙালাহর সাথে যুক্ত করে দেন। খৃষ্টীয় ১৭০২ সনে কারতালাব খান (মুর্শিদকুলী খান) তাঁর দিওয়ানী কার্যালয় জাহাঁগীরনগর থেকে মাখসুসাবাদে (মুর্শিদাবাদ) স্থানান্তরিত করেন।

খৃষ্টীয় ১৭০৩ সনে বিহারকেও আযীমুদ্দীনের শুবাদারীর অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হয়। তখন থেকে তিনি পাটনাতে অবস্থান করতে থাকেন। আর বাঙালাহতে তাঁর নায়েব শুবাদার হিসেবে কর্তব্য পালন করতে থাকেন তাঁর পুত্র ফাররুখ সিয়ার। উড়িশার নায়েব শুবাদার হিসেবে কর্তব্য পালন করতে থাকেন কারতালাব খান (মুর্শিদ কুলী খান)। তবে বাঙালাহ, বিহার ও উড়িশার দিওয়ানী একককভাবে কারতালাব খানের (মুর্শিদ কুলী খান) ওপরই থাকে। তিনি মাখসুসাবাদে অবস্থান করেই তাঁর ওপর অর্পিত সকল দায়িত্ব নিষ্ঠাসহকারে পালন করতে থাকেন। খৃষ্টীয় ১৭০৩ সনেই কারতালাব খান দাক্ষিণাত্যে গিয়ে দিল্লীর অধিপতি আওরঙজেবের সংগে সাক্ষাত করেন। আওরঙ্গজেব তাঁকে মুর্শিদকুলী খান উপাধি দেন এবং মাখসুসাবাদের নাম তাঁর নাম অনুযায়ী মুর্শিদাবাদ রাখার অনুমতি দেন।

খৃষ্টীয় ১৭০৪ সনে মুর্শিদ কুলী খান মুর্শিদাবাদ ফিরে আসেন আর ঐ বছরই আওরঙজেব আযীমুদ্দীনকে পাটনার নাম আযীমাবাদ রাখার অনুমতি দেন।

খৃষ্টীয় ১৭০৭ সনে দিল্লীর সুলতান আওরঙ্গজেব ইন্তিকাল করেন। তাঁর পুত্র মুহাম্মাদ মুয়াযযাম শাহ আলম বাহাদুর শাহ (১ম) উপাধি ধারণ করে দিল্লীর মসনদে বসেন। বাহাদুর শাহেরই পুত্র ছিলেন আযীমুদ্দীন। বাহাদুর শাহ তাঁকে বাঙালাহ-বিহার-উড়িশার শুবাদার পদে বহাল রাখেন এবং তাঁকে আযীমুশশান উপাধিতে ভূষিত করেন।

৭৯. খান-ই-জাহান

খৃষ্টীয় ১৭১২ সনে দিল্লীর সুলতান শাহ আলম বাহাদুর শাহ (১ম) ইন্তিকাল করেন। তাঁর ইন্তিকালের পর মসনদ নিয়ে যেই যুদ্ধ হয় তাতে আযীমুশ্শান নিহত হন। মুয়ীযুদ্দীন জাহাঁদার শাহ দিল্লীর মসনদে বসেন।

জাহাঁদার শাহ খান-ই-জাহানকে শুবা বাঙালাহর শুবাদার নিযুক্ত করেন।

৮০. ফারখুন্দা সিয়ার

খৃষ্টীয় ১৭১৩ সনে ফাররুখ সিয়ার সুলতান জাহাঁদার শাহকে পরাজিত করে দিল্লীর মসনদে বসেন।

তিনি নামকাওয়াস্তে তাঁর শিশুপুত্র ফারখুন্দা সিয়ারকে বাঙালাহর শুবাদার নিযুক্ত করেন। আর মুর্শিদ কুলী খানকে করেন তাঁর নায়েব শুবাদার। অবশ্য উড়িশার শুবাদারী মুর্শিদ কুলী খানের উপরই ন্যস্ত থাকে।

৮১. মীর জুমলা উবাইদুল্লাহ

খৃষ্টীয় ১৭১৩ সনেই ফারখুন্দা সিয়ার ইন্তিকাল করেন। দিল্লীর সুলতান ফাররুখ সিয়ার মীর জুমলা উবাইদুল্লাহকে বাঙালাহর শুবাদার নিযুক্ত করেন। নায়েব শুবাদার পদে বহাল থাকেন মুর্শিদ কুলী খান।

৮২. মুর্শিদকুলী খান

খৃষ্টীয় ১৭১৬ সনে দিল্লীর সুলতান ফাররুখ সিয়ার উড়িশার শুবাদার ও বাঙালাহ্‌র নায়েব শুবাদার মুর্শিদ কুলী খানকে উড়িশার সাথে বাঙালাহ্‌র শুবাদার পদ প্রদান করেন।

খৃষ্টীয় ১৭১৯ সনে ফাররুখ সিয়ার নিহত হন। দিল্লীর মসনদে বসেন রাফীউদ্‌দারাজাত। দুই মাস পর তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন। মসনদে বসেন তাঁর ভাই রাফীউদ্‌দাওলাত। ঐ সনে দুই ভাই-ই ইন্তিকাল করেন।

শাহ্‌জাদা রওশন আখতার 'মুহাম্মাদ শাহ' উপাধি ধারণ করে দিল্লীর মসনদে বসেন। মুর্শিদ কুলী খান দিল্লীর নতুন সুলতানদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে থাকেন। তাঁরাও তাঁকে বাঙালাহ্‌ ও উড়িশার শুবাদার পদে বহাল রাখেন।

মুর্শিদ কুলী খান ছিলেন একজন শিয়া। তবে তিনি একজন ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নিয়মিত সালাত আদায় করতেন। তিনি জ্ঞানী ব্যক্তিদের কদর করতেন। তিনি ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক। এক প্রতিবেশির স্ত্রীর সাথে অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপন করার কারণে তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। তিনি সাধারণ জীবন যাপন করতেন। মোটা ভাত খাওয়াই ছিলো তাঁর পছন্দ। আম ছিল তার প্রিয় ফল। তিনি মুর্শিদাবাদের কাটরা মাদ্রাসা নির্মাণ করেন।

অপরাধ দমনে তিনি ছিলেন কঠোর। ফলে দেশে শান্তি-শৃংখলা বিরাজমান ছিলো। অমুসলমানদেরকেও তিনি মর্যাদা দিতেন। বহু অমুসলিম তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। তাদের মধ্যে ছিলেন উমিচাঁদ, ফতেহ্‌ চাঁদ জগৎ শেঠ প্রমুখ।

খৃষ্টীয় ১৭২৭ সনে তিনি ইন্তিকাল করেন।

৮৩. শুজাউদ্দীন মুহাম্মাদ খান

মুর্শিদ কুলী খানের একমাত্র জীবিত সন্তান ছিলেন জীনাতুন্নিসা। তাঁর স্বামী ছিলেন শুজাউদ্দীন মুহাম্মাদ খান। অপর স্ত্রীর দিকে বেশি মনোযোগী হয়ে পড়ায় জীনাতুন্নিসা স্বামীর বাড়ি থেকে চলে এসে আব্বা মুর্শিদ কুলী খানের সাথে বসবাস করতে থাকেন। তাঁর পুত্র ছিলেন সরফরাজ খান।

মুর্শিদ কুলী খান সরফরাজ খানকে তাঁর উত্তরাধিকারী অর্থাৎ বাঙালাহ্‌ ও উড়িশার শুবাদার মনোনীত করেন। শুজাউদ্দীন মুহাম্মাদ খান তখন উড়িশার নায়েব শুবাদার। তিনি এই মনোনয়ন মেনে নিতে পারেন নি। তিনি বাঙালাহ্‌র শুবাদার হতে আগ্রহী ছিলেন। তিনি ফতেহ্‌ চাঁদ জগৎ শেঠ, হাজী আহমাদ ও হাজী আহমাদের ভাই মির্যা মুহাম্মাদ আলীর (আলীবর্দী খান) সমর্থন লাভ করেন।

শুজাউদ্দীন মুহাম্মাদ খান তাঁর পক্ষে নিযুক্তিপত্র লাভের জন্য দিল্লীতে তাঁর প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। একই সময় তাঁর সেনাদল নিয়ে তিনি মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হন। পথিমধ্যে তিনি খবর পান যে মুর্শিদ কুলী খান ইন্তিকাল করেছেন। আবার দিল্লীর সুলতান মুহাম্মাদ শাহের নিযুক্তি পত্রও তাঁর হাতে এসে পৌঁছে।

খৃষ্টীয় ১৭২৭ সনে শুজাউদ্দীন মুহাম্মাদ বাঙালাহ্-উড়িশার শুবাদার হিসেবে মুর্শিদাবাদের মসনদে বসেন।

শুজাউদ্দীন মির্যা মুহাম্মাদ আলীকে আলীবর্দী খান উপাধি দেন। তিনি আলীবর্দী খান, হাজী আহমাদ, ফতেহ্ চাঁদ জগৎশেঠ ও রায় রায়ান আলম চাঁদকে নিয়ে একটি প্রশাসনিক কমিটি গঠন করেন।

তিনি তাঁর বড় ছেলে সরফরাজ খানকে বাঙালাহর দিওয়ান ও দ্বিতীয় ছেলে মুহাম্মাদ তাকী খানকে উড়িশার নায়েব শুবাদার পদে বহাল রাখেন।

হাজী আহমাদের ছিলেন তিন ছেলে। তাঁরা হলেন মুহাম্মাদ রিদা খান (নাওয়াজিস মুহাম্মাদ), আগা মুহাম্মাদ খান (মির্যা সাঈদ আহমাদ খান) ও মুহাম্মাদ হাশেম আলী খান (মির্যা যাইনুদ্দীন আহমাদ খান)।

হাজী আহমাদের ভাই মির্যা মুহাম্মাদ আলীর (আলীবর্দী খান) ছিলেন তিন কন্যা। তাঁরা হাজী আহমাদের তিন পুত্রের সাথে বিবাহিতা হন। শুজাউদ্দীন হাজী আহমাদের তিন ছেলেকে গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদে নিযুক্ত করেন। তিনি তাঁর জামাতা মুর্শিদ কুলী জাফর খানকে (দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলী খান) জাহাঁগীর নগরের (ঢাকা) নায়েব শুবাদার নিযুক্ত করেন। আর মীর হাবিবকে নিযুক্ত করেন তাঁর সহকারী।

শুজাউদ্দীন মুহাম্মাদ খান একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তোলেন। এর সৈন্য সংখ্যা ছিলো পঁচিশ হাজার।

পার্বত্য ত্রিপুরা রাজার মৃত্যু হলে যুবরাজকে মসনদে বসতে না দিয়ে তাঁর চাচা নিজেই মসনদে বসেন। যুবরাজ পালিয়ে জাহাঁগীরনগর পৌঁছেন এবং নায়েব শুবাদার মুর্শিদ কুলী জাফর খানের নিকট সামরিক সাহায্য চান।

মুর্শিদ কুলী জাফর খান মীর হাবিবের সেনাপতিত্বে একদল সৈন্য পাঠান যুব রাজের সাহায্যে। তাঁর সহযোগী হন আগা সাদিক। পার্বত্য পথ অতিক্রম করে তাঁরা পার্বত্য ত্রিপুরা পৌঁছলে ক্ষমতা জবর দখলকারী রাজা গভীর জংগলে পালিয়ে যান। মীর হাবীব যুবরাজকে মসনদে বসান। তবে তিনি পার্বত্য ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে সামরিক ফাঁড়ি স্থাপন করেন ও গোটা পার্বত্য ত্রিপুরার ফৌজদার নিযুক্ত করেন আগা সাদিককে।

মীর হাবীব জাহাঁগীনগর (ঢাকা) ফিরে এসে মালে গানীমাহর প্রধান অংশ ও অনেকগুলো হাতী মুর্শিদাবাদে পাঠান। শুবাদার শুজাউদ্দীন মুহাম্মাদ খান পার্বত্য ত্রিপুরার নাম রাখেন রওশানাবাদ।

খৃষ্টীয় ১৭৩৩ সনে বিহারের শুবাদার ফাখরুদ্দৌলাহ্ পদচ্যুত হন। অতপর শুবা বিহারকে শুবা বাঙালাহর সাথে যুক্ত করে দেয়া হয়। অর্থাৎ শুজাউদ্দীন মুহাম্মাদ খান এবার একই সময় বাঙালাহ-বিহার-উড়িশার শুবাদার হন। মির্যা মুহাম্মাদ আলী (আলীবর্দী খান) নিযুক্ত হন বিহারের নায়েব শুবাদার।

এই পদে নিযুক্তি লাভের পূর্বে মির্যা মুহাম্মাদ আলীর (আলীবর্দী খান) কনিষ্ঠা কন্যা আমীনাহর গর্ভে ও মুহাম্মাদ হাশেম আলী খানের (যাইনুদ্দীন আহমাদ খান) এক পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করেন। আলীবর্দী খান তাঁর নাম রাখেন (নিজের নামের অনুরূপ) মির্যা মুহাম্মদ আলী খান। এই মির্যা মুহাম্মাদ আলী খানই পরবর্তী কালে উপাধি পেয়ে ছিলেন সিরাজুদ্দৌলাহ্ খান।

ইংরেজগণ বাঙালায় তাদের প্রাইভেট ব্যবসা চালাতেই থাকে। শুবাদার মুর্শিদ কুলী খানের ইন্তিকালের পর থেকে তারা কলকাতা, সূতানটি ও গোবিন্দপুর গ্রামের রাজস্ব দেয়া বন্ধ করে দেয়। শুজাউদ্দীন তাদেরকে বকেয়া রাজস্ব পরিশোধের তাকিদ দেন। তারা তাঁর কথায় কান দেয়নি।

খৃষ্টীয় ১৭৩৬ সনে শুজাউদ্দীন মুহাম্মাদ খান মুর্শিদাবাদের নিকটবর্তী আজিমগঞ্জে ইংরেজদের পণ্য আটক করেন। ফলে ইংরেজদের কাসিমবাজার কুঠির কর্মকর্তা পঞ্চাশ হাজার টাকা পরিশোধ করেন।

দিল্লীর সুলতান আওরঙ্গজেবের শাসনকালে মহারাষ্ট্রের মারাঠাগণ উগ্র হিন্দুত্ববাদী শিবাজীর নেতৃত্বে সংগঠিত হয়ে মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে লড়তে থাকে। এই ধারা অব্যাহত থাকে। সুলতান মুহাম্মাদ শাহের শাসনকালে মারাঠাগণ দিল্লীর ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে। অপর দিকে ইরানে ক্ষমতাসীন হন নাদির শাহ্। তিনিও দিল্লীর প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়ান।

শুজাউদ্দীন মুহাম্মাদ খান একজন দীনদার ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ শাসক। গুণী জ্ঞানীদের তিনি কদর করতেন। তিনি অকাতরে অর্থ দান করতেন। খৃষ্টীয় ১৭৩৯ সনে তিনি তাঁর পুত্র সরফরাজ খানকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। ঐ সনেরই ১৩ই মার্চ বাঙালাহ-বিহার-উড়িশার শুবাদার শুজাউদ্দীন মুহাম্মাদ খান ইন্তিকাল করেন।

৮৪. আলাউদ্ দাওলাত সরফরাজ খান

ইরানের অধিপতি নাদির শাহের আক্রমণে তখন দিল্লীতে মুগল শাসনের চরম দুর্দিন। এই গোলযোগের সময় তাঁর পুত্রের নামে নিযুক্তি পত্র প্রদানের জন্য

শুজাউদ্দীন মুহাম্মাদ খান দিল্লীর সুলতানের নিকট আবেদন জানিয়ে ছিলেন কিনা তা জানা যায় না।

তিনি তাঁর পুত্রকে উপদেশ দিয়ে যান হাজী আহমাদ, রায়রায়ান আলম চাঁদ ও ফতেহ চাঁদ জগৎ শেঠের সাথে পরামর্শ করে শাসন কার্য পরিচালনা করতে।

শুজাউদ্দীন মুহাম্মাদ খানের ইন্তিকালের পর আলাউদ্দাওলাত সরফরাজ খান বাঙালাহ-বিহার-উড়িশার শুবাদার হিসেবে মুর্শিদাবাদের মসনদে বসেন।

দিল্লীতে কর্তৃত্ব স্থাপন করে ইরান-সম্রাট নাদির শাহ বাঙালাহ-বিহার-উড়িশার শুবাদার শুজাউদ্দীন মুহাম্মাদ খানকে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করা ও রাজস্ব প্রেরণের জন্য চিঠি পাঠান। ইতিমধ্যে শুজাউদ্দীন ইন্তিকাল করেন। চিঠি পান সরফরাজ খান। হাজী আহমাদ ও আলম চাঁদ সরফরাজ খানকে নাদির শাহের আনুগত্য স্বীকার করতে, তাঁর নামে খুতবাহ পাঠ করতে ও তাঁর নামে মুদ্রা জারি করতে পরামর্শ দেন। তিনি তাই করেন।

নাদির শাহ অল্পকাল পর ভারত ছেড়ে চলে যান। হাজী আহমাদ ও তাঁর ভাই আলীবর্দী খান গোপনে দিল্লীর সুলতান মুহাম্মাদ শাহের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে শুবাদার সরফরাজ খান সম্পর্কে তাঁর কান ভারি করেন। আলীবর্দী খান একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির মাধ্যমে নিজের নামে শুবাদারীর নিয়োগপত্র হাছিলের চেষ্টা চালান।

খৃষ্টীয় ১৭৪০ সনের প্রথম ভাগে আলীবর্দী খান তাঁর জামাতা মুহাম্মাদ হাশেম আলী খানকে (যাইনুদ্দীন আহমাদ খান) বিহারের নায়েব শুবাদার নিযুক্ত করে নিজে সসৈন্যে মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হন। সরফরাজ খান মুর্শিদাবাদ থেকে ২২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত গিরিয়া নামক স্থানে আলীবর্দী খানকে বাধা দেন। যুদ্ধে আলীবর্দী খান সুবিধা করে উঠতে পারেন নি। তিনি শান্তি চুক্তির জন্য প্রস্তুত বলে ভাণ করেন।

৯ই এপ্রিল ভোর বেলা তিনি সরফরাজ খানের ছাউনীতে অতর্কিত হামলা চালান। সরফরাজ খান তখন সালাতুল ফাজর আদায় করছিলেন। এই আকস্মিক হামলা মুকাবিলা করার জন্য তিনি সৈন্যদেরকে সংগঠিত করার সুযোগও পেলেন না। তবুও অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে তিনি রুখে দাঁড়ান। কপালে গুলির আঘাত লেগে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। রায় রায়ান আলম চাঁদ যুদ্ধে আহত হয়ে আত্মহত্যা করেন। সরফরাজ খানের হাতী চালক তাঁর লাশ মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসেন।

৮৫. আলীবর্দী খান

খৃষ্টীয় ১৭৪০ সনের ৯ই এপ্রিল আলীবর্দী খান বাঙালাহ -বিহার-উড়িশার নাযিম হিসেবে মুর্শিদাবাদের মসনদে বসেন। তিনি নিহত সরফরাজ খানের পরিবার-

পরিজনের সাথে ভালো ব্যবহার করেন এবং তাদেরকে জাহাঁনগীরনগর (ঢাকা) পাঠিয়ে দেন।

খৃষ্টীয় ১৭৪০ সনের নভেম্বর মাসে তিনি দিল্লীর সুলতান মুহাম্মাদ শাহের নিযুক্তি পত্র লাভ করেন।

আলীবর্দী খান যাইনুদ্দীন আহমাদ খানকে বিহারের নায়েব শুবাদার পদে বহাল রাখেন।

জাহাঁগীরনগর-সিলেট-রওশানাবাদের নায়েব শুবাদার নিযুক্ত করেন নাওয়াজিস মুহাম্মাদ খানকে। সাঈদ আহমাদ খানকে নিযুক্ত করেন উড়িশার নায়েব শুবাদার।

তাঁর নাতী (যাইনুদ্দীন আহমাদ খানের পুত্র) সিরাজুদ্দৌলাহ খানকে জাহাঁগীর নগরের নাওয়ারা বা নৌ-বাহিনীর কমাণ্ডার পদে নিযুক্তি দেন। অবশ্য তরুণ সিরাজদ্দৌলাহ খান রাজধানী মুর্শিদাবাদেই অবস্থান করতেন।

উড়িশা তখনো সাবেক শুবাদার সরফরাজ খান কর্তৃক নিযুক্ত নায়েব শুবাদার মুর্শিদ কুলী জাফর খানের শাসনাধীনে ছিলো। আলীবর্দী খান সসৈন্যে এগিয়ে আসেন। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মুর্শিদ কুলী জাফর খান দাক্ষিণাত্যে পালিয়ে যান। আলীবর্দী খান সাঈদ আহমাদ খানকে পূর্বেই উড়িশার নায়েব শুবাদার পদে নিযুক্তি দিয়ে ছিলেন। এবার তিনি কার্যতঃ নায়েব শুবাদার হন। আলীবর্দী খান তাঁকে নাসিরুল মুলক সাওলাত জঙ উপাধি দেন।

জাহাঁগীরনগরের (ঢাকা) প্রশাসক মির্যা হাবীব সরফরাজ খানের প্রতি কৃত আলীবর্দী খানের আচরণে দারুণভাবে বিক্ষুব্ধ হন। তিনি এতোখানি বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে আলীবর্দী খানের বিরোধিতা করতে গিয়ে তিনি মারাঠাদের সাথে হাত মিলাতে কুণ্ঠিত হন নি।

উল্লেখ্য যে মারাঠাদের মূল আবাসভূমি মহারাষ্ট্র। দিল্লীর সুলতান মুহীউদ্দীন মুহাম্মাদ আওরঙজেব আলমগীরের শাসনকালে উগ্র হিন্দু শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠাগণ বিদ্রোহী হয়। হত্যা, লুণ্ঠন ও আগুন লাগানো ছিলো তাদের কর্মতৎপরতার প্রধান বৈশিষ্ট।

খৃষ্টীয় ১৬৮০ সনে শিবাজীর মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র শম্ভুজী বিদ্রোহ অব্যাহত রাখেন। মুগল বাহিনীর নিকট পরাজিত হয়ে তিনি বন্দী হন। শম্ভুজী বন্দী অবস্থায় থেকেও অসদাচরণ করতে থাকেন। ফলে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। অতপর সুলতান শম্ভুজীর সতর বছরের ছেলে সাহুকে রাজা উপাধি দিয়ে একটি এলাকার রাজা বানিয়ে দেন।

মারাঠাগণ তাদের খাসলত বদলাতে পারেনি। আলীবর্দী খানের শাসনকালে বেরারে মারাঠাদের শাসক ছিলেন রঘুজী ভোঁসলে। মীর্যা হাবীব তাঁকে বাঙালাহ আক্রমণের

উস্কানি দেন। রঘুজী ভোঁসলে তাঁর সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে পচিশ হাজার অশ্বারোহী মারাঠা সৈন্য বাঙালাহ্‌র দিকে পাঠান। খৃষ্টীয় ১৭৪২ সনে মারাঠাগণ পশ্চিম বংগের বর্ধমান শহরে আগুন লাগিয়ে দেয়। মূল্যবান দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করে। আলীবর্দী খান সসৈন্যে বর্ধমান এসে তাদের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। এই সুযোগে মির্যা হাবীব একদল মারাঠা সৈন্য নিয়ে মুর্শিদাবাদের একাংশে ঢুকে ব্যাপক লুটতরাজ চালান। মির্যা হাবীব হুগলী দখল করে সেখানেও ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেন।

আলীবর্দী খান বিহারের নায়েব শুবাদার যাইনুদ্দীন আহমাদ খানকে (হাশেম আলী খানকে) সৈন্য নিয়ে এগিয়ে আসার নির্দেশ দেন। তিনি নিজেও একটি বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন। পশ্চিম বংগ ও উড়িশায় মারাঠাদের সাথে কয়েক দফা মুকাবিলা হয়। মীর হাবিব ও ভাস্কর পণ্ডিত যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দক্ষিণ দিকে সরে যান। খৃষ্টীয় ১৭৪৩ সনে আলীবর্দী খান আবদুন নবী খানকে উড়িশার নায়েব শুবাদার ও রায় দুর্লভ রামকে তাঁর সহকারী নিযুক্ত করে রাজধানী মুর্শিদাবাদ ফিরে আসেন।

কিন্তু অল্পকাল পরেই মারাঠাগণ দুই দিক থেকে এগিয়ে আসে। একটি দল উড়িশা থেকে রঘুজী ভোঁসলের নেতৃত্বে এবং আরেকটি দল পেশওয়া বালাজী রাওয়ের নেতৃত্বে বিহার থেকে বাঙালাহ্‌র দিকে অগ্রসর হয়। আলীবর্দী খান ২২ লাখ টাকা প্রদান করে বালাজী রাওয়ের সাথে সন্ধি করেন। রঘুজী ভোঁসলে একলা যুদ্ধের ঝুঁকি না নিয়ে উড়িশার দিকে ফিরে যান।

খৃষ্টীয় ১৭৪৪ সনে ভাস্কর পণ্ডিত ২০ হাজার অশ্বারোহী যোদ্ধা নিয়ে বাঙালাহ্‌র ওপর হামলা চালান। তাঁর ধ্বংস ও লুণ্ঠনের মাত্রা এবার ছিলো আরো অনেক বেশি। রাজা জানকী রামের দূতিয়ালীর ফলে ভাস্কর পণ্ডিত আলীবর্দী খানের সাথে সাক্ষাত করতে আসেন। আলীবর্দী খানের সৈন্যগণ হামলা চালিয়ে তাঁকে হত্যা করেন।

মারাঠাদের সাথে লড়াইকালে আলীবর্দী খান অন্যতম আফগান (পাঠান) সরদার মুস্‌তাফা খানকে বিহারের নায়েব শুবাদার নিযুক্ত করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। পরে তিনি তাঁকে বিপজ্জনক মনে করেন। মুসতাফা খান শিয়া মতাবলম্বী আলীবর্দী খানের বিরুদ্ধে সুন্নী আফগান সরদারদেরকে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে আলীবর্দী খানের কাছ থেকে তাঁর প্রাপ্য টাকা বুঝে নিয়ে বিহারের দিকে চলে যান। আকস্মিকভাবে তিনি বিহারের রাজধানী পাটনা আক্রমণ করেন। নায়েব শুবাদার যাইনুদ্দীন আহমাদ খান (হাশেম আলী খান) সতর্ক ছিলেন বলে সহজেই এ আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হন।

খৃষ্টীয় ১৭৪৫ সনে মারাঠা সরদার রঘুজী ভোঁসলে ও মীর হাবিব উড়িশা দখল করে পশ্চিম বংগের কাটওয়াতে আসেন। অতপর তাঁরা বিহারে প্রবেশ করে ব্যাপক

লুটতরাজ চালান। আলীবর্দী খান এগিয়ে আসেন। এই সুযোগে মীর হাবিবের পরামর্শে মারাঠাগণ ঝড়ের বেগে রাজধানী মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করে তা লুণ্ঠন করে কাটওয়াতে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করে। আলীবর্দী খান তাদেরকে শায়েস্তা করার জন্য কাটওয়ার দিকে আসেন। এইভাবে যুদ্ধের পর যুদ্ধ চলতে থাকে। তবে উড়িশা মীর হাবিবের নিয়ন্ত্রণে থেকে যায়।

খৃষ্টীয় ১৭৪৮ সনের জানুয়ারী মাসে বিদ্রোহী আফগান কমাণ্ডারগণ পাটনাতে যাইনুদ্দীন আহমাদ খান হাজী আহমাদসহ অনেককেই হত্যা করে। এই দুঃসংবাদ শুনে আলীবর্দী খান, পাটনার দিকে রওয়ানা হন। মীর হাবিব মারাঠাদেরকে নিয়ে তাঁর পিছু পিছু অগ্রসর হন ও ডানে-বামে অসংখ্য গ্রাম পুড়িয়ে ছারখার করেন। আফগানদের বিরুদ্ধে পাটনার যুদ্ধে আলীবর্দী খান বিজয়ী হলে মীর হাবিব উড়িশার দিকে চলে যান। পাটনার যুদ্ধে সিরাজুদ্দৌলাহ খান নানার পাশে থেকে বীরত্বের সাথে লড়াই করেন।

খৃষ্টীয় ১৭৫১ সনে মীর হাবিবের নেতৃত্বাধীন মারাঠাদের সাথে আলীবর্দী খান একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এর ফলে মীর হাবিব উড়িশার শাসন কর্তৃত্ব লাভ করেন। মারাঠাগণও অনেক আর্থিক সুবিধা লাভ করে। মীর হাবিব বাঙলাহর মুসলিম রাজনৈতিক শক্তিকে দুর্বল করার ক্ষেত্রে বড়ো রকমের ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁকে সাথে না পেলে মারাঠাগণ বাঙালাহর মানুষের এতো বেশি ক্ষতি করতে পারতো না। শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার এক বছর পর রঘুজী ভোঁসলের পুত্র জানোজীর হাতে মীর হাবিব নিহত হন। আলীবর্দী খান মীর হাবিবের আত্মীয় মির্যা সালিহকে উড়িশার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কার্যত: উড়িশা মারাঠাদের কর্তৃত্বাধীনে চলে যায়।

এই মারাঠাদেরকে গ্রাম বাংলার মানুষ 'বর্গী' নামে আখ্যায়িত করে। প্রায় দশটি বছর ধরে প্রধানতঃ পশ্চিম বংগের মানুষ নিদারুণ কষ্ট ভোগ করেছেন। মারাঠাগণ গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে দিতো। লোকদের মূল্যবান সম্পদ লুণ্ঠন করতো। পশু সম্পদ নিয়ে যেতো। লোকদের হাত, পা, কান, নাক কেটে দিতো। সুন্দরী নারীদেরকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যেতো। তাদের ভয়ে ব্যবসায়ীরা পালিয়ে বেড়াতো। বহু ব্যবসায়ী দেশান্তরে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। তারা হঠাৎ আসতো, আবার হঠাৎ চলে যেতো। তাদের উপর্যুপরি হামলার ফলে বাঙালাহর অর্থনীতি দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আলীবর্দী খান যখন মারাঠাদের নিয়ে ব্যস্ত তখন ইংরেজগণ নীরবে কলকাতায় নিজেদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে চলে।

আলীবর্দী খান অমুসলিমদের ওপর বেশ নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন। খৃষ্টীয় ১৭৫২ সনে বিহারের নায়েব শুবাদার মারা গেলে তিনি তাঁর ছেলে রাম নারায়ণকে ঐ পদে নিযুক্ত করেন। রাজা রামসিংহকে নিযুক্ত করেন মেদিনীপুরের ফৌজদার। নাওয়াজিস মুহাম্মাদ খান জাহাঁগীরনগরের (ঢাকা) প্রশাসক ছিলেন। তিনি প্রধানত মুর্শিদাবাদেই থাকতেন। ওখানকার শাসনকার্য পরিচালনা করতেন রাজা রাজ বল্লভ ও গোকুল চাঁদ। শেষ দিকে আলীবর্দী খানের দিওয়ান ছিলেন রায়রায়ান উমিচাঁদ। সামরিক বাহিনীর দিওয়ান নিযুক্ত হন রায় দুর্লভ রাম।

আলীবর্দী খান তাঁর ছোট মেয়ে আমীনাহর ছেলে সিরাজদ্দৌলাহ খানকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। বড় মেয়ে মেহেরুন্নিসা ওরফে ঘসেটি বেগম এই মনোনয়ন মেনে নিতে পারেননি। তিনি নিজেই মসনদ পেতে আগ্রহী ছিলেন। আলীবর্দী খানের দ্বিতীয় মেয়ে রাবেয়ার ছেলে শাওকাত জঙ তখন পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা। তিনিও সিরাজুদ্দৌলাহ খানের মনোনয়ন মেনে নিতে পারেন নি। সামরিক বাহিনীর বখশী মীর জাফর আলী খানও ছিলেন উচ্চাভিলাষী। মসনদের দিকে তাঁরও ছিলো লোলুপ দৃষ্টি।

খৃষ্টীয় ১৭৪৮ সনে ইংরেজগণ আর্মেনিয়ানদের কয়েকটি জাহাজ দখল করে। আলীবর্দী খান জাহাজগুলো মালিকদেরকে ফেরত দেবার জন্য ইংরেজদেরকে বলেন। নির্দেশ জারির সাথে সাথে তিনি বিভিন্ন ইংরেজ কুঠির দিকেও সৈন্যও পাঠান। তাঁর দৃঢ়তা দেখে ইংরেজগণ আর্মেনিয়ান বণিকদের জাহাজগুলো ফেরত দেয়।

এই ধরনের বিভিন্ন কারণে ইংরেজগণ আলী বর্দী খানের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতো। বাঙালাহ-বিহার-উড়িশায় তাদের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব স্থাপনের পথে তারা আলীবর্দী খানকে পথের কাঁটা মনে করতো। তাঁকে সরিয়ে নিজেদের পছন্দের লোক মুর্শিদাবাদের মসনদে বসানোর প্রয়োজনীয়তা তারা তীব্রভাবে অনুভব করে।

আলীবর্দী খানের আত্মীয়দের মধ্যে বিরাজমান অনৈক্য ও রেষারেষি ইংরেজদের দৃষ্টি এড়ায়নি। তদুপরি বাঙালায় একটি শক্তিশালী অমুসলিম বণিক শ্রেণীর উত্থান ঘটে। এই শ্রেণীটিও ক্রমশ বাঙালাহর রাজনৈতিক অংগনে একটি ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়ায়। এইটিও ইংরেজদের দৃষ্টি এড়ায়নি।

ইংরেজগণ বাঙালাহতে তাদের ব্যবসা চালাবার জন্য হিন্দুদের মধ্য থেকেই এজেন্ট ও কন্ট্রাকটর নিযুক্ত করতো। হিন্দুগণও অনুভব করতে শুরু করে যে ইংরেজদের সাথে ব্যবসা বাণিজ্যে জড়ালেই রাতারাতি ধনী হওয়া যায়।

ইংরেজগণ কলকাতায় তাদের ফোর্ট উইলিয়াম নামক দুর্গটিকে আরো বেশি দুর্ভেদ্য করে তোলে। কলকাতায় তারা সার্বভৌম অধিকার প্রয়োগ করতে থাকে।

শুবাদারের শক্রদেরকে তারা বিনা কুণ্ঠায় আশ্রয় দিতে শুরু করে। চোরাচালানীর অপরাধে অভিযুক্ত রামকৃষ্ণ শেঠকে তারা আশ্রয় দেয় ও তাকে ফেরত দেয়ার নির্দেশ অমান্য করে। ব্যবসা ক্ষেত্রেও তারা চরম অসাধুতার আশ্রয় নিতে থাকে।

আলীবর্দী খান বার্ধক্যের কারণে দুর্বল হয়ে গেছেন। কয়েকজন নিকটাত্মীয়ের ইন্তিকালে তিনি মন ভাংগা। ইংরেজদের সব চক্রান্তই তিনি আঁচ করতে পারছিলেন। কিন্তু পদক্ষেপ নিতে ছিলেন দ্বিধান্বিত। সিরাজুদ্দৌলাহ্ খান কিন্তু ইংরেজদের চক্রান্ত নস্যাৎ করার জন্য কঠোর পদক্ষেপের পক্ষপাতী ছিলেন। এই মনোভংগির জন্য তিনি ছিলেন ইংরেজদের চক্ষুশূল। ইংরেজগণ আলীবর্দী খানের ইন্তিকালের আগেই ঘসেটি বেগমের প্রতি তাদের সমর্থন ব্যক্ত করে।

জাহাঁগীরনগরের (ঢাকা) দিওয়ান রাজা রাজবল্লভও ছিলেন ঘসেটি বেগমের সমর্থক।

অসুস্থ্ আলীবর্দী খানের পক্ষ থেকে সিরাজুদ্দৌলাহ্ খান ইংরেজদেরকে ডেকে ঘসেটি বেগমের সাথে সংশ্রব না রাখার জন্য বলেন। সিরাজুদ্দৌলাহ্ খান জাহাঁগীরনগরের (ঢাকা) দিওয়ান রাজা রাজ বল্লভের নিকট কয়েক বছরের টাকা পয়সার হিসাব চান। তিনি কলকাতার ইংরেজদের সাথে গোপনে যোগাযোগ করে তাদের আশ্রয় চান। তাঁর ছেলে কৃষ্ণ বল্লভ তিপ্পান্ন লাখ টাকা মূল্যের ধন সম্পদ নিয়ে সপরিবারে কলকাতায় ইংরেজদের নিকট চলে যান। রাজা রাজবল্লভ সিরাজুদ্দৌলাহ্ খানকে জানান যে তাঁর ছেলে কৃষ্ণ বল্লভ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে পালিয়ে যাওয়ায় তার পক্ষে হিসাব দেয়া সম্ভব হচ্ছেনা। খৃষ্টীয় ১৭৫৬ সনের দশই এপ্রিল বাঙালাহ-বিহার-উড়িশার শুবাদার আলীবর্দী খান ইন্তিকাল করেন।

৮৬. সিরাজুদ্দৌলাহ্ খান

আলীবর্দী খান সিরাজুদ্দৌলাহ্ খানকে হীরাঝিল নামে একটি প্রাসাদ তৈরি করে দিয়েছিলেন। সিরাজুদ্দৌলাহ্ খান ঐ প্রাসাদেই বসবাস করতেন। ইন্তিকালের কিছুকাল আগে আলীবর্দী খান তাঁকে নিজের কাছে ডেকে নিয়ে এসে কিছু উপদেশ দেন।

খৃষ্টীয় ১৭৫৬ সনের এপ্রিল মাসে আলীবর্দী খানের ইন্তিকাল হলে সিরাজুদ্দৌলাহ্ খান বাঙালাহ্-বিহার-উড়িশার নাযিম হিসেবে মুর্শিদাবাদের মসনদে বসেন। উল্লেখ্য যে বহুকাল আগে থেকেই বাঙালাহ-বিহার-উড়িশার নাযিমগণ 'নওয়াব' বলেও আখ্যায়িত হতে থাকেন। আরো উল্লেখ্য যে ঐ সময় দিল্লীর সুলতান ছিলেন দ্বিতীয় আলমগীর।

নওয়াব সিরাজুদ্দৌলাহ্ খানের বড়ো খালাম্মা মেহেরুন্নিসা ওরফে ঘসেটি বেগম মোতিঝিল প্রাসাদে বসবাস করতেন। এই প্রাসাদটি তাঁকে তৈরি করে দিয়েছিলেন আলীবর্দী খান। ঘসেটি বেগম মোতিঝিল প্রাসাদে বসে তাঁর ধন-রত্ন বন্টন করে একদল সৈন্যকে তাঁর পক্ষে ভিড়িয়ে একটি অতর্কিত হামলার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। সিরাজুদ্দৌলাহ খান দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে মোতিঝিল প্রাসাদে তাঁকে অন্তরীণ করে রাখেন।

দৃঢ়চেতা সিরাজুদ্দৌলাহ্ খান ফোর্ট উইলিয়ামের গভর্ণর রোজার ড্রেককে বলেন কৃষ্ণ বল্লভকে ফেরত পাঠাতে। রোজার ড্রেক এক ধৃষ্টতাপূর্ণ চিঠির মাধ্যমে জানান যে ইংরেজগণ একজন আশ্রিত ব্যক্তিকে কিছুতেই ফেরত দিতে পারেনা। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নয়, কোন স্বাধীন রাষ্ট্রের শক্তিশালী শাসকের পক্ষ থেকেই এই ধরনের বক্তব্য উচ্চারিত হতে পারে।

সিরাজুদ্দৌলাহ্ খান চাচ্ছিলেন ইংরেজদের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলোর শান্তিপূর্ণ সমাধান। হুগলীর অন্যতম ব্যবসায়ী খাজা ওয়াজিদের মাধ্যমে তিনি চারবার মীমাংসার প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু ইংরেজগণ তাঁর কথায় কান দেয়নি।

সিরাজুদ্দৌলাহ্ খান ছিলেন একজন সাহসী তরুণ। ইংরেজদের ধৃষ্টতায় রাগান্বিত হয়ে তিনি তাঁর সৈন্যদল সহ কাসিম বাজার পৌঁছেন ও ইংরেজদের বাণিজ্য কুঠিতে তালা লাগিয়ে দেন।

অতপর তিনি সসৈন্যে কলকাতার দিকে অগ্রসর হন। কাসিমবাজার অভিযানের আগেই ফোর্ট উইলিয়াম গভর্ণর রোজার ড্রেক সাহায্য চেয়ে চিঠি পাঠান মাদ্রাজের ফোর্ট জর্জের অধিনায়কের কাছে। সিরাজুদ্দৌলাহ খান কলকাতা পৌঁছার আগেই রোজার ড্রেক নওয়াবের ভাটি অঞ্চলে অবস্থিত থানা দুর্গ ও সুখ সাগর ফাঁড়ি দখল করে নেন। অবশ্য নওয়াবের প্রেরিত একটি অগ্রবাহিনী সেখান থেকে ইংরেজদেরকে তাড়িয়ে দেয়।

খৃষ্টীয় ১৭৫৬ সনের ১৬ই জুন সিরাজুদ্দৌলাহ খান ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে কলকাতা পৌঁছেন। যুদ্ধ শুরু হয়। দুই দিন যুদ্ধ করার পর অবস্থা বেগতিক দেখে রোজার ড্রেক তাঁর সৈন্য বাহিনীর প্রধান অংশ নিয়ে নদীপথে ফলতা চলে যান। হলওয়েলের নেতৃত্বে বাকি সৈন্যরা ২০শে জুন নওয়াবের নিকট আত্মসমর্পণ করে। অর্থাৎ ১৭৫৬ সনের ২০শে জুন ফোর্ট উইলিয়াম সিরাজুদ্দৌলাহ খানের হস্তগত হয়।

রাতে ৪০/৫০ জন ইংরেজ সৈন্য মদ খেয়ে মাতলামি শুরু করে। নওয়াবের রক্ষীরা তাদেরকে ধরে একটি রুমে আটক করে রাখে। চার দিন যুদ্ধ করে তারা ছিলো দারুণ ক্লান্ত। বন্দীদের মধ্যে ২০ জন মারা যায়।

হলওয়েল ইংরেজদেরকে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য এই ঘটনাকে ব্ল্যাক হোল ট্র্যাজিডি বা অন্ধকূপ হত্যা নাম দিয়ে অতিরঞ্জিত এক কাহিনী রচনা করেন যার সারকথা নিম্নরূপ ঃ দুর্গের একটি অন্ধকার ছোট্ট কক্ষ। দৈর্ঘ আঠার ফিট। প্রস্থ চৌদ্দ ফিট দশ ইঞ্চি। এখানে ১৪৬ জন ইংরেজকে বন্দী করে রাখা হয়। দম বন্ধ হয়ে মারা যায় ১২৩ জন। বেঁচে থাকে মাত্র ২৩ জন।

পরদিন অর্থাৎ ২১শে জুন সেনাপতি মীরমদন মিঃ হলওয়েল, মিসেস উইলিয়াম কেরী ও আরো তিনজন বিশিষ্ট ইংরেজ বন্দীকে নওয়াবের সামনে হাজির করেন। মহানুভব নওয়াব তাঁদের সকলকে মুক্তি দেন।

সিরাজুদ্দৌলাহ্ খানের আসল নাম ছিলো মির্যা মুহাম্মাদ আলী খান। তাঁর নামের একাংশ অনুসারে কলকাতার নাম রাখা হয় আলী নগর। সিরাজুদ্দৌলাহ্ খান মানিক চাঁদকে আলী নগরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

কলকাতার দেশীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন উমিচাঁদ। তিনি ছিলেন একজন শিখ। তাঁর আসল নাম আমিন চাঁদ রূঢ়ি। উমিচাঁদ নামেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

উমিচাঁদ আলীবর্দী খানের সাথে বিহার থেকে মুর্শিদাবাদ এসেছিলেন। আলীবর্দী খানের অর্থানুকূল্যে তিনি কলকাতায় একটি বাড়ি ও একটি দোকান কিনেন। তাঁর ব্যবসা ছিলো জমজমাট। কালক্রমে ইংরেজদের সাথে তাঁর সখ্যতা গড়ে উঠে।

ফোর্ট উইলিয়াম জয়ের পর সিরাজুদ্দৌলাহ্ খান যখন মুর্শিদাবাদ ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখন উমিচাঁদ এলেন ইংরেজদের পক্ষে ওকালতি করতে। তাঁর অনুনয় বিনয়ের ফলে নওয়াব আবার ইংরেজদেরকে ব্যবসা চালিয়ে যাবার অনুমতি দিয়ে মুর্শিদাবাদ ফিরলেন।

খৃষ্টীয় ১৭৫৬ সনের অকটোবর মাস। সিরাজুদ্দৌলাহ্ খানের খালাতো ভাই (রাবেয়া বেগমের পুত্র) পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা শাওকাত জঙ বিদ্রোহী হয়ে উঠেন। তিনি মুর্শিদাবাদের দিকে অভিযান চালাবার ফন্দি ফিকির করছিলেন। খবর পেয়ে সিরাজুদ্দৌলাহ্ খান ঝড়ের বেগে পৌঁছে গেলেন পূর্ণিয়া। যুদ্ধ শুরু হয়। কামানের গোলায় আহত হয়ে ইন্তিকাল করলেন শাওকাত জঙ।

সিরাজুদ্দৌলাহ্ খান তাঁর নানা আলীবর্দী খানের মতোই সাহসী যোদ্ধা ছিলেন। মসনদে বসার আট মাসের মধ্যে তাঁকে ঘসেটি বেগমের মোতিঝিল প্রাসাদ, ইংরেজদের কাসিম বাজার কুঠি, ইংরেজদের শক্ত ঘাঁটি ফোর্ট উইলিয়াম ও পূর্ণিয়াতে সামরিক অভিযান পরিচালনা করতে হয়। প্রতিটি অভিযানেই তিনি সফল হন। সেনাপতি মীরমদন ও মোহন লাল অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে তাঁকে সহযোগিতা করতে থাকেন।

কলকাতায় পরাজয়ের খবর পেয়ে মাদ্রাজের ফোর্ট জর্জে মিটিংয়ে বসলেন শীর্ষস্থানীয় ইংরেজ কর্মকর্তাগণ। কলকাতায় কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সৈন্য পাঠাবার সিদ্ধান্ত হয় ঐ মিটিংয়ে।

খৃষ্টীয় ১৭৫৬ সনের ১৬ই অকটোবর কর্ণেল রবার্ট ক্লাইভ ও এডমিরাল ওয়াটসন কয়েকটি রণ-তরী বোঝাই সৈন্য নিয়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। ১৫ই ডিসেম্বর তারা ফলতা পৌঁছেন। এরপর তাঁরা কলকাতার দিকে এগুতে থাকেন। ইতিমধ্যে কলকাতার শাসনকর্তা মানিক চাঁদ অর্থের বিনিময়ে গোপনে ইংরেজদের দলে ভিড়ে যান। তাই তিনি যুদ্ধের ও পরাজয়ের ভাণ করে কলকাতা ছেড়ে দিয়ে মুর্শিদাবাদ চলে আসেন।

খৃষ্টীয় ১৭৫৭ সনের ২রা জানুয়ারী কর্ণেল রবার্ট ক্লাইভ ও এডমিরাল ওয়াটসন ফোর্ট উইলিয়াম প্রবেশ করেন। এরপর তাঁদের পরিচালিত সৈন্যগণ হুগলী শহর দখল করে ব্যাপক লুটতরাজ চালায়।

সিরাজুদ্দৌলাহ্ খান ইংরেজদের ঔদ্ধত্য চূর্ণ করার জন্য সসৈন্যে কলকাতার নিকটে পৌঁছে শিবির স্থাপন করেন।

এই সময় ইউরোপে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধে। ধূর্ত কর্ণেল রবার্ট ক্লাইভ দেখলেন এই সময়টি সিরাজুদ্দৌলাহ্‌র সাথে যুদ্ধ করার অনুকূল সময় নয়। ফ্রেঞ্চগণ যদি সিরাজুদ্দৌলাহ্ খানের বাহিনীর সাথে যোগ দেয় তাহলে সমূহ বিপদ। তাই তিনি সন্ধির অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। খৃষ্টীয় ১৭৫৭ সনের ৯ই ফেব্রুয়ারী একটি শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইংরেজগণ অনেক সুবিধা আদায় করে নেয়। এই চুক্তিরই নাম আলীনগর চুক্তি।

আলীনগর চুক্তি স্বাক্ষরের পর ইংরেজগণ ফ্রেঞ্চদের চান্দেরনগর (চন্দন নগর) কুঠি আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়। খবর পেয়ে সিরাজুদ্দৌলাহ্ খান হুগলীর নতুন ফৌজদার নন্দ কুমারকে চান্দের নগরের পথে ইংরেজদের গতিরোধ করার নির্দেশ দেন। রবার্ট ক্লাইভ এগিয়ে এসে সসৈন্যে নন্দ কুমারকে উপস্থিত দেখে ভড়কে যান। তিনি উমি চাঁদের সহযোগিতায় বহু টাকার বিনিময়ে নন্দ কুমারকে দলে ভিড়াতে সক্ষম হন। নন্দ কুমার পথ ছেড়ে দেন। ইংরেজগণ চান্দের নগর আক্রমণ করে দখল করে নেয়। পরাজিত ফ্রেঞ্চগণ মুর্শিদাবাদে এসে সিরাজুদ্দৌল্লাহ্‌র শরণাপন্ন হয়।

ফতেহ চাঁদ জগৎ শেঠ প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন যাতে সিরাজুদ্দৌলাহ্ খান ইংরেজদের বিরুদ্ধে কোন কঠোর পদক্ষেপ না নেন।

ফ্রেঞ্চদের চান্দের নগর কুঠি দখলের পর রবার্ট ক্লাইভ বিশিষ্ট ইংরেজদের একটি সভা ডেকে বললেন যে মুর্শিদাবাদও দখল করতে হবে।

খৃষ্টীয় ১৭৫৭ সনের ২৩শে এপ্রিল ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিল সিরাজুদ্দৌলাহ্ খানের পতন ঘটাবার প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন করে। রবার্ট ক্লাইভ উমি চাঁদ, ফতেহ্ চাঁদ জগৎ শেঠ ও রায় দুর্লভ রামের মাধ্যমে সেনাপতি মীর জাফর আলী খানকে মুর্শিদাবাদের মসনদে বসাবার প্রলোভন দেন। ৩রা জুনের মধ্যেই আঁতাত পাকাপাকি হয়ে যায়।

রবার্ট ক্লাইভ ফ্রেঞ্চদেরকে ধাওয়া করার জন্য সৈন্য বাহিনী নিয়ে পাটনা যাওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সিরাজুদ্দৌলাহ্ খান সেনাপতি মীর জাফর আলী খানকে নির্দেশ দেন পলাশীতে গিয়ে অবস্থান নিতে যাতে ইংরেজদের পাটনামুখী অভিযানে বাধা দেয়া যায়। পরে ইংরেজগণ ঐ পরিকল্পনা বাদ দেয়। মুর্শিদাবাদই তাদের প্রধান টার্গেট হয়ে দাঁড়ায়। সিরাজুদ্দৌলাহ্ খান মীর জাফর আলী খানকে মুর্শিদাবাদ ডেকে নেন।

সিরাজুদ্দৌলাহ্র গুপ্তচর মতিরাম কলকাতা থেকে ইংরেজদের গতিবিধির খবর পাঠান। এই দিকে মীরজাফর আলী খানের চক্রান্তের খবরও পেয়ে যান নওয়াব। ঘরে বাইরে শত্রু। তিনি অস্থির হয়ে পড়েন। সিরাজুদ্দৌলাহ্ খান তাঁর হীরাঝিল প্রাসাদে মীর জাফর আলী খানকে ডেকে পাঠান এবং দেশের এই দুর্দিনে তাঁর আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন। আল কুরআন স্পর্শ করে মীরজাফর আলী খান বললেন যে এই বারের যুদ্ধে তিনি প্রাণপণ লড়বেন। সিরাজুদ্দৌলাহ্ খান তাঁকে প্রধান সেনাপতি পদ প্রদান করে আবার পলাশীর দিকে যাবার প্রস্তুতি নিতে বললেন। মীরজাফর আলী খান, মোহন লাল, রায়দুর্লভ, মীর মদন, ইয়ার লতিফ খান, ফ্রেঞ্চ সেনাপতি সিন ফ্রে প্রমুখ সিরাজুদ্দৌলাহ্র সহযাত্রী হন। তাঁরা যথাসময়ে পলাশী প্রান্তরে এসে ছাউনী ফেলেন।

সেনাপতি মীরজাফর আলী খান তাঁর গুপ্তচর উমার বেগের মাধ্যমে সিরাজুদ্দৌলাহ্ খানের রণ-প্রস্তুতি সম্পর্কে ইংরেজদেরকে অবহিত করতে থাকেন।

ভাগিরথী নদীর তীরে ছিলো কাটওয়া দুর্গ। এই দুর্গটি ছিলো বাঙালাহ্র দুর্ভেদ্য দুর্গগুলোর একটি। রবার্ট ক্লাইভ কাটওয়ার ওপর হামলা চালান। মীরজাফর আলী খানের গোপন নির্দেশ পেয়ে দুর্গের অধিপতি ইংরেজ সৈন্যদেরকে বাধা দিলেন না। রবার্ট ক্লাইভ কাটওয়া দুর্গ দখল করেন।

খৃষ্টীয় ১৭৫৭ সনের ২২ জুন কর্ণেল রবার্ট ক্লাইভ তাঁর বাহিনী নিয়ে পলাশীর আম বাগানে এসে পৌঁছেন। তিনি ইংরেজ বাহিনীকে চারভাগে বিভক্ত করে মেজর কুট, মেজর গ্র্যান্ট, মেজর কিলপ্যাট্রিক ও ক্যাপ্টিন গপ-এর অধীনে ন্যস্ত করেন। মাঝখানে ইংরেজ সৈন্য, আর ডানে বায়ে ভাড়াটিয়া দেশীয় সৈন্যদেরকে মোতায়েন করেন। সামনে বসান ছয়টি কামান।

অপর দিকে, সেনাপতি মীরমদন আমবাগানের সামনে দীঘির নিকটে তাঁর সৈন্যদেরকে মোতায়েন করেন। পশ্চিম পাশে অবস্থান গ্রহণ করেন ফ্রেঞ্চ সেনাপতি সিন ফ্রে। পূর্ব দিকে থাকেন সেনাপতি মোহন লাল। সম্মুখ বাহিনীর শেষ সীমানায় দাঁড়ান সেনাপতি মীরজাফর আলী খান।

খৃষ্টীয় ১৭৫৭ সনের ২৩শে জুন। সকাল আটটায় মীরমদনের কামান গর্জে উঠে। তারপর উভয় পক্ষ থেকে কামানের গোলা আর বন্দুকের গুলি বর্ষিত হতে থাকে ঝাঁকে ঝাঁকে। আধ ঘন্টা ধরে যুদ্ধ চলে। উভয় পক্ষে বেশ কিছু সৈনিক হতাহত হয়। রবার্ট ক্লাইভ ভয় পেয়ে যান। তিনি উমিচাঁদকে তিরস্কার করতে শুরু করেন। উমিচাঁদ তাঁকে আশ্বস্ত করেন যে মীরমদন আর মোহনলাল ছাড়া বাকি সেনাপতিরা যুদ্ধে অংশ নেবেন না। এই দুইজনকে সামলাতে পারলেই বিজয়।

মীরজাফর আলী খান, ইয়ার লতিফ খান, রায় দুর্লভ, আমীর বেগ, খাদিম হুসাইন খান প্রমুখ সেনাপতিগণ পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থাকলেন তাঁদের সৈন্যদল নিয়ে। মীর মদন, মোহন লাল ও সিনফ্রের কামান গর্জে উঠতে থাকে বারবার। ইংরেজদের একটি গোলার আঘাতে মীর মদন আহত হন। সিরাজুদ্দৌলাহ খানের শিবিরে আনার পর তিনি ইন্তিকাল করেন। বীর বিক্রমে লড়ে যাচ্ছিলেন মোহনলাল। ইংরেজদের অবস্থান তখন খুব সংগীন। প্রধান সেনাপতি মীরজাফর আলী খান সিরাজুদ্দৌলাহ খানকে পরামর্শ দেন যে, রাত ঘনিয়ে এসেছে, অতএব আজকের মতো যুদ্ধ বন্ধ রাখা হোক। সিরাজুদ্দৌলাহ তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করেন ও যুদ্ধ বন্ধের নির্দেশ দেন। মোহনলাল দৌড়ে আসেন তাঁর কাছে এবং বিজয়লাভের কাছাকাছি এসে যুদ্ধ না থামাবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন। প্রতিবাদ করলেন মীর জাফর আলী খান। ক্ষুণ্ন মনে আপন শিবিরে চলে যান মোহন লাল।

মীর জাফর আলী খান রবার্ট ক্লাইভের নিকট চিঠি পাঠালেন আবার হামলা করার জন্য। কর্ণেল রবার্ট ক্লাইভ ও মেজর কিলপ্যাট্রিক তাঁদের সৈন্য দল নিয়ে সিরাজুদ্দৌলাহ খানের বাহিনীর দিকে অগ্রসর হচ্ছেন দেখে সেনাপতি মোহনলাল ও সিনফ্রে আবার ফিরে দাঁড়ান। আবার প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়। মীর জাফর আলী খান ও অন্যান্য সেনাপতিদের সৈন্যরা যুদ্ধের নির্দেশ না পেয়ে এদিক-ওদিক পালাতে শুরু করে। রায় দুর্লভ ও রাজা রাজবল্লভ সিরাজুদ্দৌলাহ খানকে ফুসলাতে থাকেন রণাংগন ছেড়ে যাবার জন্য। তিনি তাঁদের কথা মতো রণাংগন থেকে সরে যান। এতে তাঁর সৈন্যদের মধ্যে হতাশা ছড়িয়ে পড়ে। হাতীর ওপর বসে মীর জাফর আলী খান ও রায়দুর্লভ যুদ্ধের তামাসা উপভোগ করতে থাকেন। এই নাজুক অবস্থায় সেনাপতি মোহনলাল ও সেনাপতি সিনফ্রে বাধ্য হয়ে রণাংগন ত্যাগ করেন। পলাশী প্রান্তরে বাঙালাহ-বিহার-উড়িশার স্বাধীন নাযিম সিরাজুদ্দৌলাহ খান

পরাজিত হন। বাঙালাহ-বিহার-উড়িশার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা চলে যায় সুদূর ইউরোপ থেকে আসা ইংরেজদের হাতে।

খৃষ্টীয় ১৭৫৭ সনের ২৪শে জুন। মুর্শিদাবাদে এসে সিরাজুদ্দৌলাহ খান আবার চেষ্টা করলেন তাঁর লোকদেরকে সংগঠিত করতে। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন। তাই বেগম লুৎফুন্নিসা, শিশু কন্যা উম্মু জুহরা ও একজন মাত্র দেহরক্ষী নিয়ে তিনি প্রাসাদ ত্যাগ করেন। ভগবানগোলা অতিক্রম করে তিনি পৌঁছেন গোদাগাড়ি। এখান থেকে নৌকায় চড়ে মহানন্দা নদীপথে তিনি রওয়ানা হন উত্তর দিকে। তিনি যেতে চেয়েছিলেন বিহার। উদ্দেশ্য ছিলো সেখানে গিয়ে ফ্রেঞ্চ সৈন্যদের সাহায্য নিয়ে তিনি আবার লড়বেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে।

অপর দিকে সেনাপতি মীর জাফর আলী খান তাঁর পুত্র মীরনকে নিয়ে দাদপুরে গিয়ে রবার্ট ক্লাইভের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেন। রবার্ট ক্লাইভ তাঁকে পরামর্শ দেন অবিলম্বে মুর্শিদাবাদ গিয়ে সিরাজুদ্দৌলাহ খানকে গ্রেফতার করতে।

কালিন্দী নদী পেরিয়ে সিরাজুদ্দৌলাহ শাহপুর নামক একটি গ্রামে পৌঁছেন। তিনি নৌকা থেকে নেমে একটি মাসজিদে আসেন খাদ্যের সন্ধানে। পরনে তাঁর ছদ্মবেশ। কিন্তু তাঁর সুদর্শন চেহারা তো লুকাবার কোন উপায় ছিলো না। শাহপুর গ্রামের আশেপাশে যেই দলটি সিরাজুদ্দৌলাহ খানকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলো তাঁদের নেতৃত্বে ছিলেন মীর জাফর আলী খানের জামাতা মীর কাসিম আলী খান। একজন লোক গিয়ে তাঁকে আগন্তুকের কথা জানায়। মীর কাসিম আলী খান ছুটে আসেন সেখানে। তিনি সিরাজুদ্দৌলাহ খান, বেগম লুৎফুন্নিসা ও তাঁদের শিশু কন্যা উম্মু জুহরাকে গ্রেফতার করে মুর্শিদাবাদে পাঠিয়ে দেন মীর জাফর আলী খানের পুত্র মীরনের কাছে। তাঁকে জাফরাগঞ্জ প্রাসাদের একটি নিভৃত কক্ষে বন্দী করে রাখা হয়।

খৃষ্টীয় ১৭৫৭ সনের ২রা জুলাই ভোর বেলা বন্দীশালায় প্রবেশ করে মীরনের প্রেরিত ঘাতক। হাতে তার নাঙা তলোয়ার। সিরাজুদ্দৌলাহ খান তাকে লক্ষ্য করে কিছু কথা বলেন। হিংস্র মূর্তি নিয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে থাকে মুহাম্মাদী বেগ। তিনি বললেন, "আমাকে একটু অযুর পানি এনে দাও। আমি করুণাময় আল্লাহর উদ্দেশ্যে শেষ নামায পড়ে যেতে চাই।"

মুহাম্মাদী বেগ তাঁর ঘাড়ে সজোরে তলোয়ারের আঘাত হানে। অস্ফুট 'আল্লাহ' শব্দ বের হয় সিরাজুদ্দৌলাহ খানের মুখ থেকে। আঘাতের পর আঘাত হেনে মুহাম্মাদী বেগ ক্ষতবিক্ষত করে ফেলে নওয়াবের দেহটি। রক্ত স্রোতের উপর লুটিয়ে পড়েন বাঙালাহ-বিহার-উড়িশার নাযিম, নবাব, শেষ স্বাধীন মুসলিম শাসক সিরাজুদ্দৌলাহ খান।

উপসংহার

ইসলামের সোনালী যুগে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শাসককে বলা হতো আমীরুল মুমিনীন। তিনি মুমিনদের প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিবর্গের মতামতের ভিত্তিতে নির্বাচিত হতেন। কেউ নেতৃত্ব পদ চাইতেন না। ফলে নেতৃত্ব পদ নিয়ে কাড়াকাড়ি ছিলো না। উম্মাহ্‌র সর্বোত্তম ব্যক্তির ওপর নেতৃত্ব পদ চাপিয়ে দিতো শাসিতরা।

আমীরুল মুমিনীনের প্রধান কর্তব্য ছিলো আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা। তিনি আল কুরআন ও আস্‌সুন্নাহকে আইনের প্রধান উৎস মনে করতেন। জনসাধারণকে আল কুরআন ও আসসুন্নাহ্‌র অনুসারী বানাবার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাতেন। তদুপরি ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য সম্পর্কে জনগণকে ওয়াকিফহাল করে তোলার জন্য আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন।

আমীরুল মুমিনীন একাকী কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতেন না। তাঁকে পরামর্শ ও সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য থাকতো মাজলিসুশ শূরা বা পরামর্শ পরিষদ। মাজলিসুশ শূরার সাথে পরামর্শ করে তিনি রাষ্ট্র-পরিচালনা করতেন। ফলে তিনি থাকতেন স্বেচ্ছাচারিতা দোষ মুক্ত।

আমীরুল মুমিনীন ও মাজলিসুশ শূরার সদস্যগণ ছিলেন আল্লাহ ভীরু। আখিরাতে আল্লাহ্‌র আদালতে দাঁড়িয়ে তাঁদের জীবনের ছোট-বড়ো সকল কাজ সম্পর্কে জওয়াবদিহি করতে হবে– এই অনুভূতি সদা জাগ্রত থাকতো তাঁদের অন্তরে। তাই তাঁরা ছিলেন স্বার্থপরতা, হিংসা-বিদ্বেষ ও দুর্নীতির উর্ধে। তাঁদের মাঝে ছিলো সম্প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক। তাঁদের ঐক্য ছিলো গলিত সিসা দিয়ে তৈরি প্রাচীরের মতো মজবুত।

কালক্রমে মুসলিম উম্মাহ সোনালী যুগের এই সব সোনালী ঐতিহ্য থেকে দূরে সরে পড়ে। খিলাফাত ব্যবস্থা পরিত্যাগ করে। ফলে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজার থাকতেন একাধিক ছেলে। রাজা মারা গেলে কে হবেন রাজা, তা নির্ধারিত হতো ছেলেদের মধ্যে যুদ্ধের ফলাফলের ভিত্তিতে। ফলে কোন রাজা মারা গেলে তাঁর ছেলেদের মধ্যে হানাহানি ছিলো অবশ্যম্ভাবী।

এই মৌলিক বিচ্যুতির ফলে আরো অনেক ত্রুটি ঢুকে পড়ে মুসলিম উম্মাহ্‌র সামষ্টিক জীবনে। ফলে উন্নতি নয়, অবনতির দিকে ধাবিত হতে থাকে মুসলিম উম্মাহ।

এমনি তরো একটি পর্যায়ে শাসনদণ্ড হাতে নিয়ে বাংলাদেশে ঘটে মুসলিমদের আবির্ভাব। তবুও এই কথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে পতন যুগের মুসলিম শাসকদের মধ্যে এমন অনেকেই ছিলেন যাঁরা ইসলামের অনুসরণের ক্ষেত্রে আজকের মুসলিম শাসকদের চেয়ে অনেক উন্নতমানের ছিলেন।

খৃষ্টীয় ১২০৩ সনে তুর্ক মুসলিম ইখতিয়ারউদ্দীন মুহাম্মাদ বাখতিয়ার খালজী বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের সূচনা করেন। বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের স্থপতি একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম ছিলেন।

বাংলাদেশের সর্বশেষ মুসলিম শাসক ছিলেন সিরাজুদ্দৌলাহ খান। খৃষ্টীয় ১৭৫৭ সনের ২৩শে জুন পলাশীর প্রান্তরে তাঁর পরাজয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশে ৫৫৪ বছরের মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে।

সোনালী যুগের আমীরুল মুমিনীনদের মতো না হওয়া সত্বেও বাংলাদেশের মুসলিম শাসকগণ দেশ ও জাতির কল্যাণে যেই সব অবদান রেখেছেন তার মূল্য অনেক। তাঁদের অবদানের দিক বিবেচনা করতে গেলে আমরা বিস্মিত না হয়ে পারিনা।

মুসলিম শাসকগণ এই দেশে ইসলামের মুবাল্লিগ হিসেবে আসেন নি। কিন্তু তাঁদের শাসনকাল ইসলামের মুবাল্লিগদের আগমন পথ প্রশস্ত করে। শত শত মুবাল্লিগ আসেন এই দেশে। তাঁরা শহরে বন্দরে গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য উপস্থাপন করতে থাকেন। তাঁদের সংস্পর্শে এসে বহু অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে। মুসলিমদের নৈতিক মান উন্নত করার জন্য মুসলিম শাসকগণ এই দেশে বহু মাসজিদ নির্মাণ করেন। আবার প্রতিটি মাসজিদই ছিলো এক একটি শিক্ষালয়। তাছাড়া উচ্চতর ইসলামী জ্ঞান প্রদানের জন্য স্থানে স্থানে স্থাপিত হয়েছিলো মাদ্রাসা।

মুসলিম শাসকদের অধিকাংশই ছিলেন দক্ষ শাসক। আইন শৃংখলা নিশ্চিত করার জন্য তাঁরা ত্বরিৎ ও কঠোর পদক্ষেপ নিতেন। দেশে সংঘটিত অপরাধের সংখ্যা ছিলো খুবই কম। ইসলামী বিচার ব্যবস্থা অনেকাংশে প্রতিষ্ঠিত ছিলো। জনগণ শান্তিতে বসবাস করতো।

জনগণের আর্থিক অবস্থা ছিলো উন্নত। দেশে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হতো। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হতো। কাপড়, পাটজাত দ্রব্য, চাল, চিনি, লবণ, মরিচ, আদা, হরিতকি দেশের প্রয়োজন মিটিয়ে বিদেশে রফতানী হতো। তাছাড়া শুটকী, ছাগল, ভেড়া, হরিণ ও ঘৃতকুমারী কাঠও রফতানী দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। কাপড় শিল্পে বাংলাদেশের কোন জুড়ি ছিলো না। সারাদেশের বিভিন্ন এলাকায় তাঁতে কাপড় তৈরি হতো। মসলিন নামক এক প্রকার সূক্ষ্ম কাপড় তৈরি হতো এই দেশে। বিদেশে এই কাপড়ের দারুণ সমাদৃতি ছিলো। সেই কালেই একখণ্ড মসলিন কাপড় চারহাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে বলে জানা যায়।

মুসলিম শাসনকালে এই দেশ কুটির শিল্পেও ছিলো সমৃদ্ধ। বাঁশ শিল্প, বেত শিল্প, মৃৎ শিল্প, পাট শিল্প ইত্যাদিতে এই দেশের মানুষ ছিলো সুদক্ষ।

মুসলিম শাসনকালে বাংলাদেশে হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলিমগণ পাশাপাশি বসবাস করতো। চমৎকার সম্প্রীতি ছিলো তাদের মাঝে। কেউ কারো আদর্শিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতো না।

মুসলিম শাসনের পূর্বে এই দেশের রাজ-ভাষা ছিলো সংস্কৃত। এই কঠিন ভাষা অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে প্রধানত ব্রাহ্মণদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো। বাংলা ছিলো জনগণের ভাষা। হিন্দু শাসকগণ বাংলা ভাষাকে ঘৃণার চোখে দেখতেন। মুসলিম শাসকগণ বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ভাষাকে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এই প্রথম বাংলা ভাষা রাজ-দরবারে প্রবেশের অধিকার পায়। বাংলা ভাষায় অনূদিত হয় বহু বই। অনেক মৌলিক বই লিখিত হয় এই ভাষায়। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে বাংলা ভাষা মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়, উৎকর্ষতার পথে দ্রুত অগ্রসর হয়।

মুসলিম শাসনকালের একেবারে শেষের দিকের ঘটনা-প্রবাহ খুবই বেদনাদায়ক। দেশ ও জাতির যাঁরা ছিলেন কর্ণধার তাঁরা চরম হিংসা-বিদ্বেষের শিকারে পরিণত হন। তাঁদের মাঝে প্রতিহিংসা পরায়ণতা এমন জঘণ্য রূপ ধারণ করে যে প্রতিপক্ষকে হেনস্তা করার জন্য তাঁরা বিদেশীদের সাহায্য নিতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন নি। আর বিদেশীদের সাহায্য নিতে গিয়ে তাঁরা দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন করে তুলছেন কিনা তা খতিয়ে দেখার মতো মানসিক অবস্থাও তাঁদের ছিলো না। দেশ ও জাতির ভাগ্য নির্ধারণের দায়িত্ব যখন এই ধরনের ব্যক্তিদের হাতে এসে পড়ে তখন সেই দেশ ও জাতির সর্বনাশ না হয়ে পারেনা।

সময় প্রবাহের এক অধ্যায়ে এসে নেতৃস্থানীয় একদল অপরিণামদর্শী মুসলিম ও একদল অর্থলিপ্সু অমুসলিম দি ইংলিস ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পেনীর সাথে অশুভ আঁতাত গড়ে তুলে বাঙালাহ-বিহার-উড়িশায় মুসলিম শাসনের অবসান ঘটানোর নিয়ামক শক্তিতে পরিণত হন।

খৃষ্টীয় ১৭৫৭ সনের ২৩শে জুন পলাশী প্রান্তরে দি ইংলিস ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পেনীর বিজয় লাভের পরিণতিতে এই দেশের জনগণকে পরাধীনতার শিকলে আবদ্ধ হতে হয়। তাদের ওপর নেমে আসে দুর্দিন। ইংরেজগণ মুসলিম রাজশক্তিকে তছনছ করে ফেলে। তাদের সুপরিকল্পিত অর্থনৈতিক শোষণের ফলে মুসলিমদের মেরুদণ্ড ভেংগে যায়। দেশে গোলাম বানানোর উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। অপ-সংস্কৃতি চালু হয়।

অপরিণামদর্শী স্বার্থান্ধ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ নেতৃবৃন্দের ভুল সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপের ফলে এই দেশের গণমানুষকে ইংরেজদের গোলামী করতে হয় ১৯০ বছর।

ঋণ স্বীকার

১. হিস্ট্রি অব দ্যা মুসলিমস অব বেঙল, ডঃ মুহাম্মদ মোহর আলী
২. বাংলাদেশের ইতিহাস, ডঃ মুহাম্মদ আবদুর রহিম প্রমুখ
৩. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ডঃ এম. এ. রহিম
৪. ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস, এ.কে.এম. আবদুল আলীম
৫. আমি স্মৃতি আমি ইতিহাস, মোজহারুল ইসলাম
৬. বাংলাদেশে ইসলাম, আবদুল মান্নান তালিব